সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১২

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2012

With the Compliments of

Principal Staff Officer
Armed Forces Division

সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১২

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2012

... আজ লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ... তাদের জন্যই সম্ভব হয়েছে আমাদের নিজেদের মাটিতে সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা। আমি আশা করি ইন্‌শাআল্লাহ, এমন একদিন আসবে, যখন এই একাডেমি শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াই নয়, সারা দুনিয়াতে সম্মান অর্জন করবে।...

... এখন তোমাদের উপর আসছে দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব, জনগণের প্রতি দায়িত্ব, যে সমস্ত সৈনিকদের তোমরা আদেশ-উপদেশ দেবে, তাদের প্রতি দায়িত্ব এবং তোমাদের নিজেদের প্রতি দায়িত্ব। ... আজ আমি যা দেখলাম, তাতে আমি বিশ্বাস করি, পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পেলে আমাদের ছেলেরা যে কোন দেশের যে কোন সৈনিকের সাথে মোকাবিলা করতে পারবে।...

... বাংলাদেশের সৈনিক, তোমরা হবে আমাদের জনগণের বাহিনী, তোমরা শুধু পেশাদার বাহিনী নও, কেবল সামরিক বাহিনীও নও। দরকার হলে তোমাদের আপন হাতে উৎপাদন করে খেয়ে বাঁচতে হবে।...

... আজ আমি তোমাদের এই প্লাটফর্ম থেকে সামরিক বাহিনী, বেসামরিক বাহিনী, জনগণ সকলের কাছে আবেদন জানাবো, সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে অভাব, অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন।...

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি কুমিল্লায় অবস্থিত তৎকালীন বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ)-তে প্রথম শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠানে বিদায়ী ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

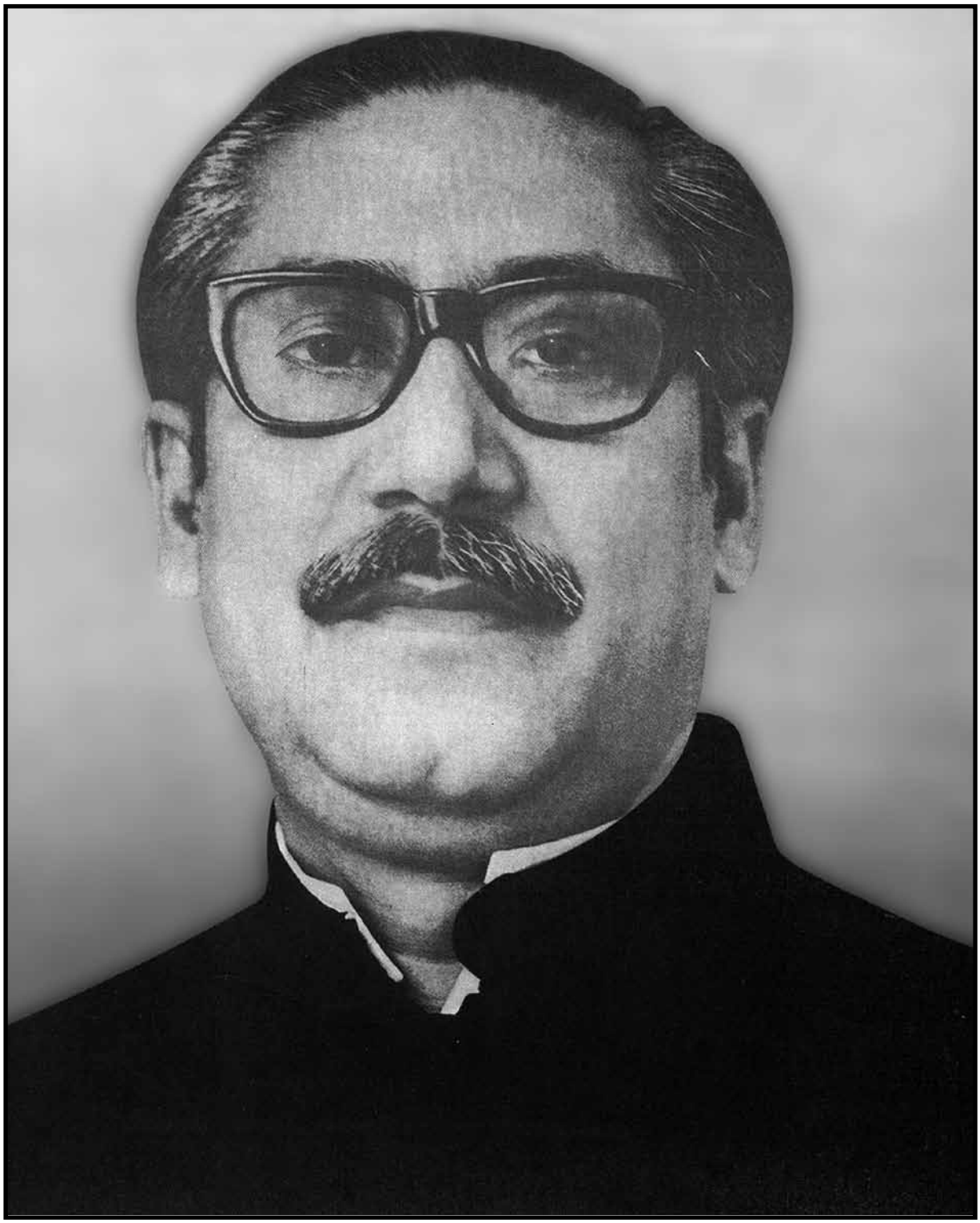

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২১ নভেম্বর ২০১২

বাণী

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১২' উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতি হিসেবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মহান স্বাধীনতার স্থপতি। দীর্ঘ দু'যুগ ধরে নানা আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আদায়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম"। অবশেষে ২৬ মার্চ ১৯৭১ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে। ফলে বিজয় ত্বরান্বিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। তাই আমাদের জাতীয় জীবনে দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতাযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতির গর্বিত সন্তান। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি তাঁরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও জাতিগঠনমূলক কাজে অংশ নিয়ে দেশবাসীর আস্থা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাঁদের অবদান দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

একুশে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর একটি গৌরবময় দিন। এ দিবসটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে নিজেদের বীরত্ব ও ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে সামনে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমি আশা করি নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল থেকে পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য নিজ নিজ বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সদা তৎপর থাকবে। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই আমাদের অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার 'ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরও অবদান রাখবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'-এ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিসহ তিন বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

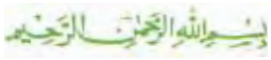

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯
২১ নভেম্বর ২০১২

বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গৌরবময় ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র সকল শহীদের প্রতি যাঁরা দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১শে নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তাঁর হাতে গড়া সে বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন তাঁদের সকল কর্মকাণ্ডে।

বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব এবং উন্নত নৈতিকতার আদর্শে স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবেন।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১২' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

★ ★ ★ ★

সেনাবাহিনী প্রধান

সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

বাণী

একুশে নভেম্বর - মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দিবস। এই দিবসটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয়। ১৯৭১ সালের এই দিনেই আত্মোৎসর্গের মহান ব্রত নিয়ে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে মুক্তিকামী আপামর জনতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল। ফলে ত্বরান্বিত হয়েছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত চূড়ান্ত বিজয় অর্জন। আত্মোৎসর্গের প্রত্যয়ে উজ্জীবিত আজকের এই মহতী দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধই আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও অসামরিক জনতা যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিশ্বের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধ, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লাখো শহীদের আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। প্রতি বছর সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদেরকে স্বাধীনতা অর্জনের সেই মহান ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের এই দিনে আমি স্বাধীনতার জন্য আত্মদানকারী সকল শহীদের বিদেহী আত্মা এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা।

শুধু স্বাধীনতা অর্জনেই নয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্য আজ দেশগঠনেও সদা প্রস্তুত। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের বিভিন্ন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সর্বমহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে চলেছে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও আমাদের সেনাবাহিনী দেশের জন্য প্রভূত সম্মান বয়ে এনেছে। তাঁদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম, অদম্য কর্মস্পৃহা, উন্নত পেশাগত দক্ষতা ও সামরিক শৃঙ্খলাবোধের জন্যই এই সম্মান অর্জন সম্ভব হচ্ছে। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাঁদের এই অর্জনকে প্রত্যয়দীপ্ত ও অম্লান রেখে দৃপ্ত পদভারে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের মহান চেতনা সকলের মাঝে জাগরূক থাকুক এই কামনা করি।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ একটি জার্নাল প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই প্রকাশনার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমার বিশ্বাস, আমাদের নতুন প্রজন্মকে সংহতির চেতনায় উজ্জীবিত করতে এই প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সহায় হউন। আমিন।

ইকবাল করিম ভূইয়া
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

★ ★ ★
নৌবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী সদর দপ্তর
বনানী, ঢাকা-১২১৩

বাণী

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে মহান একুশে নভেম্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সামরিক গুরুত্ববহ দিন। ৭১ এর রণাঙ্গনে এ দিন সর্বস্তরের জনতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য একাত্ম হয়ে পরিকল্পিত এবং সম্মিলিত আক্রমণ রচনা করে। ফলে বাঙালির বিক্রমের কাছে পরাভূত হয় হানাদার পাকবাহিনী; লক্ষ কোটি প্রাণের কাঙ্খিত বিজয় চলে আসে হাতের মুঠোয়। মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা এবং মুক্তিকামী জনতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলী আক্রমণে নিশ্চিত হয় ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়; বিশ্ব মানচিত্রের বুকে রচিত হয় বাঙালি জাতির গৌরবগাথা।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহীদদের, যাঁদের ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের ফলে বিশ্বের দরবারে একটি সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ এবং যাঁদের আত্মদান প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে। ফলে শান্তিতে ও সংগ্রামে সর্বদাই তাঁরা নিবেদিত প্রাণ দেশের তরে। জাতির ক্রান্তিকাল ও দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা তাই সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। অতীতের সফল ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও জাতির যে কোন প্রয়োজনে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

এ মহান দিনে 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১২' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তথ্যবহুল এবং বিশ্লেষণধর্মী এই জার্নাল প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমাদের এ যৌথ প্রয়াস নিশ্চয়ই দেশ ও সশস্ত্র বাহিনীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। সবশেষে, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য রইল আমার শুভ কামনা এবং সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

জহির উদ্দিন আহমেদ
ভাইস এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

بسم الله الرحمن الرحيم

বিমান বাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনী সদর দপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস

বাণী

আত্মোৎসর্গ ও দেশপ্রেমের কালজয়ী বিজয়গাথায় সমুজ্জ্বল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসে ২১শে নভেম্বর তথা 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ও অবিস্মরণীয় একটি দিন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ডের জন্য ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার আপামর জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না । এই সময়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়গুলোকে আরও সমন্বিত ও কার্যকরী করে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সমন্বিত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁরা বিভিন্ন পর্যায়ে সুশৃঙ্খল ও কার্যকর নেতৃত্ব প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করেন; ফলে ত্বরান্বিত হয় আমাদের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন, অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা। বাংলার মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করতে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর অদম্য সেনানীরা সম্মিলিত এই আক্রমণ অব্যাহত রাখে। বাংলার বীর সেনানীদের আত্মত্যাগে চির অম্লান একুশে নভেম্বর তাই প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য এক গৌরবময় ও মহিমান্বিত দিন।

আত্মত্যাগ ও আত্মবিকাশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। আর ত্যাগের অনির্বাণ শিখায় উদ্ভাসিত আজকের এই মহতী দিনে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি তাঁদেরকে, যাঁদের আত্মদানে অর্জিত হয়েছে প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ যে প্রত্যয় আর বীরত্বের ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন–তা যুগ যুগ ধরে তাঁদের উত্তরসূরীদের দেশমাতৃকার যে কোন ক্রান্তিলগ্নে নিজেকে বিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করবে । আজকের এই সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বীর সেনাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রতিবারের মত এবারও জাতীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিবসটি উদযাপনের প্রাক্কালে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উদ্যোগে একটি সমৃদ্ধ জার্নাল প্রকাশের সৃজনশীল প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। পরিশেষে, স্বাধীনতা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের অকাতরে উৎসর্গ করব– আজকের এই মহান দিবসে এই হোক আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

মোহাম্মদ ইনামুল বারী
এয়ার মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান

بسم الله الرحمن الرحيم

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
ঢাকা সেনানিবাস

মুখবন্ধ

সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মহতী দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের আত্মত্যাগ এবং অবদান বাংলাদেশের অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত যা কখনো বিস্মৃত হবার নয়। তাঁদের মহান অবদানের জন্যই আজ আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে নির্ভীকচিত্তে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সমন্বিতভাবে দেশের আপামর জনগণের সাথে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সহ সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাগণ এ দিনে একাত্ম হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ সূচনার মাধ্যমে বেগবান করে বিজয়ের ধারা; ত্বরান্বিত করে আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। বস্তুত, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাঝেই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর। আর তাই মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনীর নবপ্রজন্মের সকল সদস্যের কাছে এই মহতী দিবসটি দেশরক্ষায় আত্মোৎসর্গের জন্য নতুন করে দৃপ্ত শপথ গ্রহণের দিন।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কার্যকর ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকার যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দীক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মিলিত অনুশীলনে এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে আমাদের বীর সেনানীরা বিশ্ব পরিমন্ডলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আর্তমানবতার সেবা এবং দেশের স্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী আজ সদাপ্রস্তুত।

মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সশস্ত্র বাহিনীর একটি জার্নাল প্রকাশিত হল। জার্নালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বাহিনীত্রয়ের প্রধানগণ তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের লেখাসম্বলিত এ প্রকাশনাটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। লেখকগণ সহ সৃজনশীল এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আবদুল ওয়াদুদ
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

দেশমাতৃকার অমর সন্তান আমরা তোমাদের ভুলব না

সিপাহী মোস্তফা কামাল
বীরশ্রেষ্ঠ

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর
বীরশ্রেষ্ঠ

সিপাহী হামিদুর রহমান
বীরশ্রেষ্ঠ

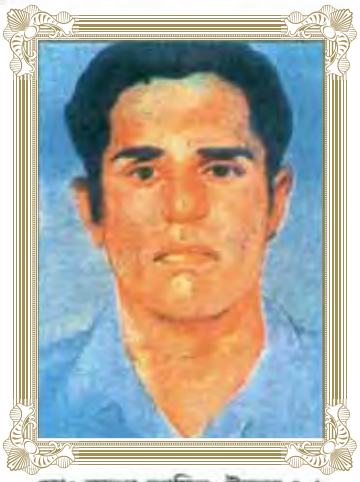

মোঃ রুহুল আমিন, ইআরএ-১
বীরশ্রেষ্ঠ

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
বীরশ্রেষ্ঠ

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
বীরশ্রেষ্ঠ

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ
বীরশ্রেষ্ঠ

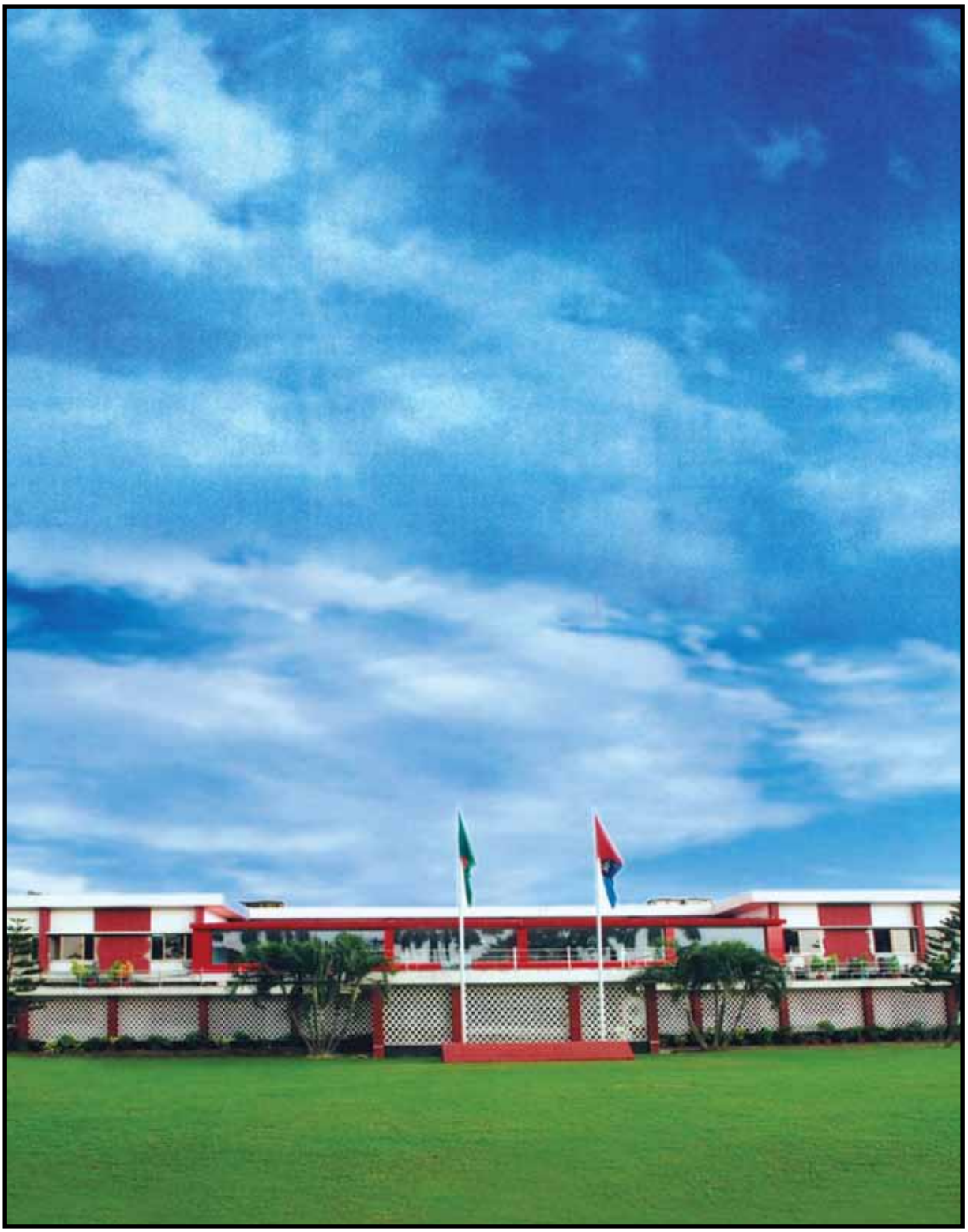

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

সম্পাদকবৃন্দ

কমডোর এম খালেদ ইকবাল, (এনডি), পিএসসি, বিএন
প্রধান সম্পাদক

উইং কমান্ডার মাখলুকার রহমান খান, পিএসসি
সম্পাদক

উইং কমান্ডার মুনছুর আহমেদ
সম্পাদক

স্কোঃ লিঃ আতাহারুল কবীর
সম্পাদক

মেজর মোঃ মনিরুজ্জামান খান
সহযোগী সম্পাদক

মেজর দিলীপ কুমার রায়
সহযোগী সম্পাদক

সম্পাদকবৃন্দ

ইঃ লেঃ কমান্ডার আবু হেনা মোহাম্মদ মশিয়ুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক

মেজর মোঃ কবির উদ্দিন সিকদার
সহযোগী সম্পাদক

মেজর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিএসসি
সহযোগী সম্পাদক

মেজর ফয়সাল হাসান খান
সহযোগী সম্পাদক

ইঃ লেঃ মাহবুব আহমদ শাহজালাল
সহযোগী সম্পাদক

EDITORIAL

The 21st November, a glorious day of remembrance for the War of Independence of Bangladesh. On this day the members of the Armed Forces pay the highest tribute to the nation and take a renewed pledge for safeguarding the independence and sovereignty of our homeland. The Armed Forces Day specially marks an enduring bond of inter-service solidarity and unity. The spirit of the day gives us a deep sense of pride and honour and is ever imprinted in the mind of every member of our Armed Forces. The day revives the treasured memories of our Liberation War, specially the moments of glory of our predecessors and supreme sacrifice made by the bravest heroes of our motherland.

The Day preserves immense significance in the history of our Liberation War. On this historic day in 1971, the patriotic members of Bangladesh Army, Navy and Air Force along with the freedom fighters from all walks of life launched an all out offensive on the occupation forces. The decisive attacks from all sectors compelled the enemy to unconditional surrender resulting into the glorious victory of Bangladesh. On this day, the nation along with the members of the Armed Forces solemnly pay homage to the martyrs of our Liberation War and express heartfelt gratitude to all the heroic freedom fighters and their family members.

In the series of commemorative events organized by the members of our Armed Forces, a tributary Journal is traditionally published under the supervision of the Armed Forces Division. It is indeed encouraging to note that the contributors of articles could spare valuable time for intellectual pursuit and present some quality papers on the ideals of our great Liberation War and other contemporary issues of military and strategic interests.

I am deeply indebted to the Principal Staff Officer, Armed Forces Division, whose vision, guidance and overall patronage were indispensable for the preparation of this Journal. He consistently encouraged us to review our ideas, refine our thought process and publish it as per plan. I would like to express my sincerest appreciation to all members of the Editorial Committee for their meaningful contribution. We are thankful to Bangladesh Air Force for accomplishing the exhaustive task of publishing the Journal. We hope and believe that the esteemed readers would sympathetically consider our shortcomings if any.

Finally we pray to the Almighty for the salvation of the departed souls of the martyrs of our War of Independence. Let our hearts and minds be always guided by the spirit of our great Liberation War and the sacrifices made by the entire nation to achieve our coveted independence.

May Allah bless us all.

Chief Editor

শিখা অনির্বাণ

সূচি

পৃষ্ঠা

১। **স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় ঃ একটি সরল বিশ্লেষণ** ০১
মেজর কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি+, আর্টিলারি

২। **বাংলাদেশের জলসীমায় শান্তি-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ** ০৫
রিয়ার এডমিরাল কাজী সারোয়ার হোসেন, (ট্যাজ), (সিডি), এনসিসি, পিএসসি, বিএন

৩। **বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার ঃ স্বনির্ভরতার পথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী** ১১
গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম কামরুল এহ্সান, এনডিসি, পিএসসি

৪। **স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় নবপ্রজন্ম** ১৪
ক্যাপ্টেন খান সজিবুল ইসলাম, আর্টিলারি

৫। **ভবিষ্যৎ বিশ্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা** ১৯
কমডোর খন্দকার তৌফিকুজ্জামান, (সি), এনডিসি, পিএসসি, বিএন

৬। **সেনাবাহিনীর সমসাময়িক উন্নয়ন ও দেশগঠনে এর ভূমিকা** ২২
মেজর দিলীপ কুমার রায়, এইসি

৭। **বঙ্গোপসাগর ও আমাদের বাংলাদেশ** ২৬
ক্যাপ্টেন এম মাহবুব-উল ইসলাম, (এন), পিএসসি, বিএন

৮। **বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগ ঃ একটি স্মৃতিময় অভিজ্ঞতা** ৩৫
স্কোয়াড্রন লিডার মোঃ শাহজালাল, জিডি(পি)

Contents

		Page
1.	**HISTORIC MARCH 1971 AND INITIAL RESISTANCE AGAINST OCCUPATION FORCES** *Brigadier General Md Sarwar Hossain, hdmc, psc*	**38**
2.	**THE BLACK SWAN IN MILITARY THEORY** *Air Vice Marshal Mahmud Hussain, ndc, psc*	**48**
3.	**INFLUENCE OF HUMAN NATURE ON INFORMATION WARFARE** *Captain Mohammad Ziauddin Alamgir, (L), psc, BN*	**54**
4.	**GRAND STRATEGY FOR A SMALL COUNTRY** *Group Captain Md Shafiqul Alam, psc*	**61**
5.	**SHAPING JUNIOR LEADERS IN ARMED FORCES: A PRAGMATIC APPROACH** *Lieutenant Colonel A K M Maksudul Haque, psc, Signals*	**66**
6.	**MARITIME DOMAIN : IMPERATIVES AND STRATEGY FOR BANGLADESH** *Captain Mir Ershad Ali, (G), psc, BN*	**73**
7.	**BANGLADESH NATIONAL AIR DEFENCE : AT NEW CROSSROADS** *Group Captain Qazi Mazharul Karim, psc*	**79**
8.	**DESIGN AND DEVELOPMENT OF SUBMARINE : SUITABLE OPTIONS FOR BANGLADESH NAVY** *Commander Khandakar Akhter Hossain, (E), psc, BN*	**86**
9.	**CAPACITY BUILDING ACTIVITIES OF BANGLADESH CONTINGENTS IN LIBERIA** *Major Md Moksed Ali, AEC*	**93**

স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় - একটি সরল বিশ্লেষণ

মেজর কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি+, আর্টিলারি

ভূমিকা

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বা শ্রেষ্ঠ অর্জন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের ভূখণ্ড সামগ্রিকভাবে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকাল ব্যতিত কখনোই সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ছিল না। হাজার বছর ধরে এই জনপদ কখনো ভিনদেশী শাসক দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছে, কখনো বা ভিন্ন জাতিসত্ত্বার শাসক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এমনকি বাংলার শেষ নবাব, পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের কাছে যার পরাজয়ে বাংলার সূর্য অস্তমিত হয় বলে আমরা বিশ্বাস করি, তিনিও তো সত্যিকার অর্থে বাঙালি ছিলেন না। যদিও, তিনি ও তার পূর্ব পুরুষগণ সুশাসক হিসেবে বাস্তবিক অর্থে এই জনপদের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। সে হিসেবে, সত্যিকারভাবে বাঙালি তার স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। যে কারণে, অতি সঙ্গতভাবেই আমরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বলি ইতিহাসের সূর্য সন্তান, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অধিকাংশই হয়তো সরাসরি যোগ দিয়েছেন, কিংবা নেপথ্যে থেকে সাহায্য করেছেন। যারা এর কোনটাই পারেন নাই, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শুভ কামনা করেছেন এবং পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতি পদে পদে পরাজয় চেয়েছেন। সে অর্থে দেশের প্রতিটি মানুষই এক একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসলই আমাদের স্বাধীনতা। বাংলাদেশে ঐ সময়ে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী দল বা গোষ্ঠী ছিল বটে তবে তাদের সংখ্যা সাকুল্যে দেশের তৎকালিন জনসংখ্যার ০.১ ভাগও হবে না। অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে এক সত্যিকারের গণজাগরণ, গণবিদ্রোহ আর গণমানুষের সংগ্রাম। ইতিহাসে এর তুলনা বিরল। ভাষার জন্য বুকের রক্ত ঝরানোর ঘটনা যেমন এই জাতিকে করেছে ইতিহাসে অদ্বিতীয়, তেমনি মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালির জীবনদান এই জাতিকে করেছে অনন্য সাধারণ। অনেকে বলার চেষ্টা করেন যে, ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমরা কখনোই স্বাধীন হতে পারতাম না। এই কথাটি একদমই ঠিক নয়। সুদীর্ঘকাল ধরে চলা বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম বাঙালিই করেছে, অন্য কেউ নয়। এটা ঠিক যে, মুক্তিযুদ্ধের সম্পূর্ণ সময় জুড়ে ভারতের পরোক্ষ সহযোগিতা কিংবা যুদ্ধের শেষভাগে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। এই লেখায় অত্যন্ত সরল বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন বাঙালির একক প্রচেষ্টাতেই সম্ভবপর হয়েছে।

জনতার যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের মার্চ মাসেই বাংলাদেশের ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক সকলেই বুঝে গিয়েছিল যে, পাকিস্তানিরা সহজে বাঙালিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এবং কোনদিনই বাঙালিদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার বা সুবিধা বুঝিয়ে দেবে না। বাঙালি তাই একরকম সংগ্রামের মানসিক প্রস্তুতি ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চেই নিয়ে নিয়েছিল। তাদের অপেক্ষা ছিল শুধুমাত্র একটি আহ্বান, ঘোষণা কিংবা স্ফুলিঙ্গের; আর তা এসেছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। যার ফলে সম্মিলিত ভাবে গর্জে উঠেছিল সারা জাতি। সমগ্র জনতা যখনই এমনভাবে একাত্ম হয়ে মুক্তি চায় তখনই তাদেরকে কেউ রোধ করতে পারে না, তা সম্ভবও নয়। এর প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, মাও বিপ্লব যেমন শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের বিজয়ের প্রমাণ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয়ের প্রমাণ বহন করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম যুদ্ধ, রাশিয়া-আফগান মুজাহিদ যুদ্ধ কিংবা হালের ইসরাইল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধ। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাঙালি জাতির এই গণযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল একটাই, তা হলো চূড়ান্ত বিজয়। এতে অন্যের সাহায্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে বটে, তবে একমাত্র কিংবা সর্বপ্রধান ভূমিকা নয়।

মুক্তিবাহিনীর ধারাবাহিক শক্তি অর্জন

নিরস্ত্র বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। তাই শুরুর দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সফলতার হার ছিল অত্যন্ত কম। একদিকে মুক্তিযোদ্ধারা ছিল অস্ত্রশস্ত্রহীন, অন্যদিকে তাদের ছিল না কোন

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ। তবে যতোই সময় যেতে লাগলো ততোই মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হলো। এপ্রিল মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর সমগ্র বাংলাদেশকে ১০টি স্থলভিত্তিক সেক্টরে ভাগ করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ প্রথম সাংগঠনিক ও অভিযানিক কাঠামো লাভ করে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে সেক্টরসমূহের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর প্রচলিত রূপরেখার আদলে মুক্তিবাহিনীর ১ম ব্রিগেড সংগঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরো দু'টি ব্রিগেড গঠন করা হয়। একদিকে মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী, গণবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধ, সেক্টরসমূহের ছোট আকারে তুড়িৎ আক্রমণ পরিচালনা ও অন্যদিকে মুক্তিবাহিনী ব্রিগেডসমূহের প্রচলিত যুদ্ধের আদলে আক্রমণ পরিচালনা অক্টোবর ১৯৭১ এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি বাহিনীর আধিপত্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করে। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ নৌবাহিনী সংগঠিতকরণ এবং 'অপারেশন জ্যাকপটে'র মতো নিখুঁত, ব্যাপক এবং সফল অভিযান পরিচালনা করা মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ বহন করে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলার মুক্তিবাহিনী যে গতিতে শক্তি সঞ্চার করছিল তাতে তাদের বিজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী।

মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

১৯৭১ এর প্রতি মুহূর্তেই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছিল মুক্তিযোদ্ধার দল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের উপর যতই তাদের অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, ততই দেশের ছাত্র, যুবক, জনতা, নারী দলে দলে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ময়দানে যোগ দেবার জন্য ঘর ছাড়ছিল। সত্যিকার অর্থে, প্রতিনিয়ত দেশপ্রেমের তাড়না, বিবেকের দহন, চোখের সম্মুখে মা-বোনের অপমান, বাবা-ভাইয়ের মৃত্যু, রাজাকারদের অত্যাচার ও দৌরাত্ম এবং সর্বোপরি সময়ের প্রয়োজনে দলে দলে অসংখ্য নারী-পুরুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিচ্ছিল। অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী তার স্বামীকে, মা তার একমাত্র পুত্রকে, প্রেমিকা তার প্রিয় মানুষকে, শিক্ষক তার ছাত্রকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছিল ক্রমাগত। তাই শুরুর দিকে হতবিহ্বল কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭১ নাগাদ কয়েক লাখে পৌঁছে যায় এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর চেয়ে জনবলে কয়েকগুণ বেশি হয়ে যায়। ক্রমবর্ধমান এই সংখ্যা নিশ্চিত ধারণা দেয় যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাই এক সময় বিজয় ছিনিয়ে আনবার জন্য যথেষ্ট ছিল। হয়তো এজন্য আরো রক্ত ঝরানোর প্রয়োজন হতো, কিংবা সময় বেশি লেগে যেতো, তবে বিজয় যে আসতো তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

দেশের বিস্তৃত স্থলের উপর আধিপত্য স্থাপন

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিল এর দিকে মুক্তিযোদ্ধারা ছোট ছোট দলে বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করে আসছিল। এছাড়াও তারা টাংগাইল, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রামের মতো কয়েকটি স্থানে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। তবে আস্তে আস্তে এপ্রিল-মে এর মধ্যে সামরিক শক্তির জোরে পাকিস্তানি বাহিনী দেশের সর্বত্র তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং মুক্তিবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশকে দেশের সীমানার বাইরে পিছু হটতে বাধ্য করে। তবে ধীরে ধীরে মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন ক্যাম্পসমূহে গোপন প্রশিক্ষণ ও সীমিত অস্ত্র-শস্ত্র লাভ করে সংগঠিত হয় ও সীমান্ত এলাকা হতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্থলের নিয়ন্ত্রণ নিতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায়, নভেম্বর ১৯৭১ এর শেষ দিকে অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আগ পর্যন্ত দেশের সীমান্তবর্তী স্থলসমূহসহ প্রায় ২৫-৩০ ভাগ স্থল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এছাড়াও সত্যিকার অর্থে দেশের সর্বত্রই রাতের বেলায় ছিল মুক্তিবাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য, কেননা অপরিচিত এলাকা, অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন জনতা এবং বিরূপ আবহাওয়ার কারণে পাকিস্তানি বাহিনী রাতের বেলা ক্যাম্পের বাইরে অতি জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বের হতে চাইতো না।

পাকিস্তানি বাহিনীর উপর নানাবিধ মানসিক চাপ

মুক্তিবাহিনীর জন্য একটা বড় সুবিধা ছিল এই যে, তারা তাদের নিজস্ব ভূমিতে নিজের জীবন ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত থাকলেও হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী নিজস্ব ভূখণ্ডের প্রায় ১২০০ মাইল দূরে বসে একটি অন্যায্য ও আগ্রাসী যুদ্ধ করছিল। ১৯৭১ এর প্রেক্ষাপটে তাদের ছিল না দেশের সংগে সহজ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবারের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ, স্থানীয়দের সহযোগিতা, সুষ্ঠু রশদ সরবরাহ ব্যবস্থা কিংবা সফলতার নিশ্চয়তা। অধিকন্তু, এই যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতি কিংবা স্থায়িত্ব নিয়েও তাদের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। এছাড়াও, অল্প দিনেই তারা বুঝতে পারে যে, তারা যুদ্ধ করছে ৮৮% মুসলমান অধ্যুষিত একটি জনপদের বিরুদ্ধে, যারা অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে

সংগ্রামে রত। তারা জেনারেল নিয়াজীর 'বাঙালি জাতির পরিচয় বদলে দেওয়া বা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর 'বাংলার সবুজ মাঠকে রক্তে লাল করে দেবার' ঘোষণাকেও ঠিক ন্যায় যুদ্ধ হিসেবে মানতে পারেনি। তাই মুক্তিযুদ্ধের শেষ ভাগে সিলেটের পাকিস্তানি ব্রিগেড কিংবা জামালপুরের ব্রিগেডের মতো অনেক স্থানেই পাকিস্তান বাহিনী বিনা যুদ্ধে তাদের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে পশ্চাৎপসরণ করে। এ সময় পাকিস্তানি বেশ কিছু ইউনিটের কর্মকর্তাসহ জওয়ানেরা বাঙালিদের উপর চলমান অত্যাচার ও নিপীড়ন মানসিক ভাবে মেনে নিতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলাসহ আত্মহত্যার মতো চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছিল। এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে, যতোই মুক্তিযুদ্ধের স্থায়িত্ব বাড়তো ততোই পাকিস্তানি বাহিনী মানসিকভাবে হীনবল হয়ে পড়তো এবং এর বিপরীতে ক্রমবর্ধমান সফলতার কারণে মুক্তিবাহিনীর মনোবল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকতো। আর এর নিশ্চিত পরিণতি ছিল অবশ্যই মুক্তিবাহিনীর বিজয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য রসদ সরবরাহ

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই পাকিস্তানি বাহিনী তাদের জন্য প্রয়োজনীয় রশদ জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এছাড়াও যুদ্ধের শুরুতে স্থানীয় জনগণের সম্পদ ও সরঞ্জামাদি লুটতরাজ করে তারা তাদের চাহিদার অতিরিক্তই পেয়ে আসছিল। তবে যতোই সময় গড়াতে লাগলো ততোই তাদের গোলাবারুদের ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসতে লাগলো। যার পরিণতিতে কামালপুর বিওপির যুদ্ধের মতো অনেক স্থানেই শেষ পর্যন্ত গোলার সংকটে তাদের পরাজয় মেনে নিতে হয়। একই সাথে, দেশের অভ্যন্তরে যতই তাদের নিয়ন্ত্রণ দিন দিন কমতে থাকলো, ততই অন্যান্য রশদেরও ঘাটতি দেখা দিতে লাগলো। পক্ষান্তরে মূল ভূখণ্ড থেকে ১২০০ মাইল দূরে শত্রুভাবাপন্ন একটি দেশ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুই অংশের মধ্যে নিয়মিত রশদ সরবরাহও ছিল অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। একই সময়ে, ভারত ও শ্রীলংকা তাদের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় এবং ভারতীয় সমুদ্র সীমায় পাকিস্তানি জাহাজসমূহকে মারণাস্ত্র নিয়ে প্রবেশাধিকার না দেওয়ায় শুধুমাত্র চীন হয়ে বিমান যোগে পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে রশদ ও গোলাবারুদ সরবরাহের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিচালনা করা ছিল পাকিস্তানের সাধ্যের বাইরে। তাই সময়ের সাথে মুক্তিবাহিনীর বিজয় ছিল অনেকটাই নিশ্চিত।

যুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাতের প্রাক্কালে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করা

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র নিজেদের অনুকূলে প্রস্তুত করা (Shaping up the battle field) যুদ্ধের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। যে কোন যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে অবতীর্ণ হবার আগেই যুদ্ধক্ষেত্রকে নিজেদের সুবিধা মতো প্রস্তুত করে শত্রুর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হলে তার সাফল্য অনিবার্য। যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রধান বিষয়সমূহ হলো শত্রুকে ক্রমাগত অনু-আঘাতের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলা, শত্রুর চলাচলের সকল স্বাধীনতা হরণ করা, শত্রুর রশদ সরবরাহ পথ ঝুঁকিপূর্ণ করা, শত্রু কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ কঠিন করে তোলা, শত্রুর মনোবল ধ্বংসের জন্য প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে সাধারণ জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা এই সকল কাজ সফলতার সাথে সম্পাদন করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মনোবল প্রায় ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছিল। বিশেষ করে রাতের বেলা কিংবা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তারা কখনো বাইরে বের হতে সাহস করতো না। এছাড়াও, তাদের জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই কৌশলে তাদেরকে ভুলতথ্য প্রদান করে বিপদে ফেলছিল। অধিকন্তু, ক্রমাগত গেরিলা চোরাগুপ্তা হামলা এবং নিশ্চিত রশদের অভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তি অনেকাংশে খর্ব হয়ে পড়ছিল। এসবের সম্মিলিত প্রভাবে ০৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ হতে মাত্র ১৩ দিনের মধ্যে যৌথ বাহিনীর বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছিল। এত কম সময়ে মুক্তিবাহিনী এবং দেশের সম্মিলিত জনতা ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য ছাড়া নিজেরাই হয়তো চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারতো না, তবে চূড়ান্ত পরিণতি আঁচ করতে পেরে ৯৫,০০০ সৈন্যের পাকিস্তানি বাহিনী যেমন ১৬ই ডিসেম্বর প্রায় বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছিল, তেমনি হয়তো আরো কয়েকমাস পরে ক্রমাগত হামলায় জর্জরিত পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর কাছে নিজেরাই আত্মসমর্পণ করতো, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণ এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ

১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে যখনই বিশ্বে আজকের মতো একটি মাত্র রাজনৈতিক বলয়ের নয় বরং তিনটি স্বতন্ত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক বলয়ের অস্তিত্ব ছিল, তখনই কোন রাষ্ট্রের জন্য অনৈতিক যুদ্ধ অন্যের ছত্রছায়ায় দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন ও চীনা একচ্ছত্র সমর্থন পেয়েছে ঠিকই, বিপরীতে কমিউনিস্ট বলয় ও ন্যাম জোটের সমর্থনসহ শক্তিশালী প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের সমর্থন ছিল মুক্তিবাহিনীর দিকে। আর তাই, মার্কিন ৭ম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে আসার হুমকির বিপরীতে রাশিয়ার প্রতি-হুমকি, জাতিসংঘে চীন-মার্কিন জোট কর্তৃক বাংলাদেশে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার প্রস্তাবের

বিপরীতে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ ভেটোর হুমকি, মুক্তিবাহিনীর প্রতি যুক্তরাজ্য ও ইরাক, ইরান, মিশরসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশের সমর্থন ইত্যাদি ছিল বাস্তবিক অর্থেই বাঙালির জন্য প্রেরণাদায়ক অনুসর্গ। এছাড়াও বাঙালির উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্রমবর্ধমান অত্যাচার, হত্যা, জুলুম, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের পরিপ্রেক্ষিতে খোদ পাকিস্তানসহ সমগ্র বিশ্বের সাধারণ জনগণ মুক্তিবাহিনীকেই নৈতিক সমর্থন দিয়ে আসছিল। মূল কথা, তখনকার পরিস্থিতিতে বিশ্ব জনমত ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ প্রত্যক্ষভাবেই ছিল পাকিস্তানের উপর। একই সময়ে, প্রবাসী বাঙালিরা এবং বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দ বিদেশে বাংলাদেশ প্রচারকেন্দ্র ও দূতাবাস খোলার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের জন্য ইতিবাচক সরব প্রচারণা চালিয়েছেন। এই বিষয়টিও বাঙালির এককভাবে যুদ্ধ জয়ের জন্য সহযোগী ভূমিকা পালন করতো বলে ধারণা করা যায়।

শেষ কথা

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রশাসনিক ও আভিধানিক বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ, ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কৌশলগত বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি এদেশের মানুষের সম্মিলিত সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে। একইভাবে, এদেশের মুক্তিযোদ্ধা ও গণমানুষের সংগ্রাম আর বৈদেশিক সাহায্য, এ সবই সম্মিলিতভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়কে করেছে ত্বরান্বিত। প্রতিটি সফলতা কিংবা অর্জনের পিছনে যেমন মূল চালিকাশক্তির পাশাপাশি অন্যান্য অনুঘটক বিদ্যমান থাকে, তেমনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি ছিল অবশ্যই আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতা। এর বাইরে বিদেশী সাহায্যসহ অন্যান্য সকল বিষয়সমূহ ছিল নিতান্তই অনুঘটকের ভূমিকায়।

এটা ঐতিহাসিক ভাবেই সত্য যে, প্রতিটি সফলতা কিংবা বিজয়ে প্রত্যেক জাতি তাদের নিজস্ব ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচারণা চালায় এবং নিজস্ব অবদানকে বড় করে দেখানোর প্রয়াস নেয়। যে কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ব্যাপারে ভারতীয় বাহিনী তাদের ভূমিকাকে মুখ্য হিসেবে দেখাতে চাইবে।

তবে যে পক্ষ, যে কারণে, যে মনোভাবই পোষণ করুক না কেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ১৯৪৭ হতে ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। একইভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় যে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী-মুক্তিযোদ্ধা-জনতার সমন্বিত ও ক্রমাগত আক্রমণের কারণেই নিশ্চিত হয়েছে তাও অস্বীকার করা যাবে না।

তথ্যসূত্র:

১। মহান মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, এরিয়া সদর দপ্তর, ময়মনসিংহ সেনানিবাস, ২৬শে মার্চ ২০০১।
২। মুক্তিযুদ্ধের দু'শো রণাঙ্গণ, মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি (অবঃ), জুন ১৯৯৮।
৩। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মেজর রফিকুল ইসলাম (অবঃ), জুন ১৯৯৫।
৪। A Tale of Millions: Bangladesh Liberation War - 1971, Major Rafiqul Islam (Retd).
৫। The Betrayal of East Pakistan, Lt Gen A. A. K. Niazi, Oxford University Press.
৬। The 1971 Indo-Pak War - A Soldiers Narrative, Maj Gen Hakeem Arshed Qureshi (Retd).
৭। How Pakistan Govt. Divided, Maj Gen Rao Farman Ali (Retd).
৮। The Way It Was, Brigadier Zahir Alam Khan, TPK (Retd).
৯। Surrender at Dacca - Birth of a Nation, Lt Gen J.F.R Jacob (Retd).
১০। The Lightening Campaign: Indo/Pakistan War - 1971, Maj Gen D.K. Palit (Retd). Compton Press Ltd.
১১। Bangladesh: A Legacy of Blood, A. Mascarenhas.

মেজর কাজী নাদির হোসেন, পিএসসি, জি+, আর্টিলারি *১১ জুন ১৯৯৮ সালে ৩৮তম বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুরের একজন গ্র্যাজুয়েট। তিনি ২০০৬ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান হতে সামরিক বিজ্ঞানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০০৮ সালে লাইবেরিয়ায় ব্যানব্যাট-১৫ এ কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে জাতিসংঘ মিশন সম্পন্ন করেন। তিনি বর্তমানে সেনাসদর, এমও পরিদপ্তরে জিএসও-২ (অপস্) হিসেবে কর্মরত আছেন।*

বাংলাদেশের জলসীমায় শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ

রিয়ার এডমিরাল কাজী সারোয়ার হোসেন, (ট্যাজ), (সিডি), এনসিসি, পিএসসি, বিএন

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সমুদ্রে গমন, বিচরণ ও আধিপত্য বিস্তারের স্পৃহা আদিম যুগ থেকেই প্রচলিত। যে জাতি সমুদ্রে যত বেশি আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছে সে জাতি তত শক্তিশালী ও উন্নত হিসেবে পৃথিবীর বুকে স্থান করে নিয়েছে। সময়ের বিবর্তনে আজ একবিংশ শতাব্দিতেও মানুষের সমুদ্র জয়ের সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। নিত্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এটি একটি নতুন পরিসর ধারণ করেছে। স্থলভাগে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলো সমুদ্র সম্পদ আহরণের প্রতি পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় খুব বেশি পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমুদ্রে আধিপত্য রক্ষা তথা সুষ্ঠু পরিবেশে জাতীয় সম্পদ আহরণে প্রায় প্রতিটি দেশের জাতীয় নীতির প্রধান কৌশল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সমুদ্রে সুশৃংখল পরিবেশ বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির বিষয়টি পুরোপুরি নিরাপত্তামূলক বিষয় এবং সম্পূর্ণভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমানে সমুদ্র এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান শক্তিশালীকরণের জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক ব্যাপক।

সমুদ্র-নির্ভর বাংলাদেশের স্থলভাগের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ এলাকাজুড়ে বিস্তৃত সমুদ্র অঞ্চল। এছাড়া রয়েছে প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী উপকূল হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত দেশের সার্বভৌমত্ব বিরাজমান। এছাড়া প্রায় দুইশত নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত 'একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা

করার অধিকার রাখে বাংলাদেশ। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নির্ভরশীল এ দেশের শতকরা নব্বই ভাগ বাণিজ্য কার্যক্রম সমুদ্র পথে দুটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর যথা চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উপরন্তু খনিজ সম্পদের আধার সমুদ্র এলাকায় গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ আবিষ্কারের অপেক্ষাধীন আছে। এছাড়া মৎস্য সম্পদের যে বিপুল ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে আমাদের সমুদ্র এলাকায় ও তৎসংলগ্ন নদ-নদীগুলোতে সেগুলোর সংরক্ষণ ও আহরণ জাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অতি সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল অন ল অব সি সংক্ষেপে 'ইটলস' এর রায়ের ফলে বাংলাদেশের যে সমুদ্র বিজয় অর্জিত হয়েছে তা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর এ বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ লাভ করেছে এক বিশাল সমুদ্র এলাকা। এ সমুদ্র এলাকাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে কার্যকর ও সফলভাবে ব্যবহার করতে হলে এ এলাকার নিরাপত্তা রক্ষাসহ এ এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে এ বিশাল এলাকায় সঞ্চিত অফুরন্ত মৎস্য সম্পদসহ অন্যান্য অখনিজ ও খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু আহরণ নিশ্চিত করতে হলে এ এলাকার উপর সবসময় কার্যকর নজরদারী নিশ্চিত করতে এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত এবং কার্যকর কোস্ট গার্ড।

বাংলাদেশের জলসীমার ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

আমাদের জাতীয় সামুদ্রিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য কী ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন সে ব্যাপারে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত সময় এখন। সমুদ্র ব্যবহারকারী দেশের সকলেই প্রত্যাশা করে যে তারা যেন নির্বিঘ্নে ও নিরাপদভাবে সমুদ্রে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে পারে। এর ফলে নিশ্চিত হবে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও অগ্রগতি। সে কারণেই আমাদের সমুদ্র এলাকায় শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার কোন বিকল্প নেই। আর তাই বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য এদেশের সামুদ্রিক প্রেক্ষাপট গভীরভাবে ও

বাস্তবতার নিরীখে বিশ্লেষণ করা উচিত। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান একটি ব-দ্বীপের ন্যায়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বঙ্গোপসাগর একটি ফানেলের আকার ধারণ করেছে। ভৌগোলিক এ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সমুদ্র বাণিজ্য নির্ভর একটি দেশে পরিণত হয়েছে। এছাড়া দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানও অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় ভিন্ন। প্রায় বক্রাকৃতি উপকূলীয় এলাকার মাঝ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নদী-নালা ও খাল-বিল এবং অসংখ্য দুর্গম পথ। এ সকল পানি পথে উপকূলীয় জনসাধারণের নির্ভয় বিচরণ নিশ্চিত করতে হলে উক্ত এলাকাসমূহে নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের জলসীমা মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণী সম্পদে ভরপুর। এ প্রাণীসম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও আহরণ আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে। তাছাড়াও আমাদের সমুদ্র এলাকায় সঞ্চিত আছে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান খনিজ পদার্থ। এ সমস্ত খনিজ সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও আহরণ করতে হলে আমাদের সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র শৃঙ্খলা রক্ষা করা অবশ্যই প্রয়োজন।

উপকূলীয় এলাকা ও অভ্যন্তরীন জলসীমার জনসংখ্যা ও তাদের নিরাপত্তা

আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল ১৯ টি জেলা নিয়ে প্রায় ৪৭,২০১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত যা দেশের মোট স্থলভাগের প্রায় ৩২ ভাগ এবং যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১০১৪ জন মানুষ বসবাস করে। এর মধ্যে ১২টি জেলার ৪৮টি উপজেলা সরাসরি সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত যেখানে জনবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ৪৮২ জন। উপকূলীয় এলাকার প্রায় সাড়ে ৩ কোটি মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে প্রায় দেড় কোটি (১.৫ কোটি) জনগণ। এ বিশাল এলাকায় জনগণের নদী ও সমুদ্রে চলাচলে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য রয়েছে মাত্র দুই হাজার কোস্ট গার্ড সদস্য। আনুপাতিক হারে প্রায় সাড়ে সাত হাজার মৎস্যজীবি এবং প্রায় ১৫ হাজার উপকূলবাসীর জন্য রয়েছে একজন কোস্ট গার্ড সদস্য যা নিতান্তই অপ্রতুল। আমাদের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় ছোট বড় অসংখ্য নদী জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। নৌ চলাচল উপযোগী নদ-নদীগুলোর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৪৩০ কিলোমিটার, তন্মধ্যে ৩০৫৮ কিলোমিটার প্রধান প্রধান নদী পথ। এসব নদী পথে লঞ্চসহ জলযান চলাচলের নিরাপত্তাসহ চোরাচালান প্রতিরোধ, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও অন্যান্য নানাবিধ কাজে কোস্ট গার্ডকে সাড়া বছর ধরে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এছাড়া সুন্দরবনের নদ-নদীসহ জলভাগের আয়তন প্রায় ১৭০০ বর্গ কিলোমিটার। এ বিশাল জলভাগ প্রতিনিয়ত টহলের আওতায় রাখার জন্য কোস্ট গার্ডের বহরে রয়েছে মাত্র ৩৪টি বোট। এছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী ৭১০ কিলোমিটার উপকূল সংলগ্ন প্রায় ৩৪০০০ বর্গ কিলোমিটার টহলে রয়েছে মাত্র ১২টি জাহাজ। আর এদের অধিকাংশই অতি পুরাতন, ছোট ও ধীরগতির হওয়ায় সমুদ্রে গমনে অনুপযোগী। ফলে কোস্ট গার্ড অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব জাহাজ দিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সমগ্র সমুদ্র এলাকার মধ্যে প্রায় ৭৭,৬২১ বর্গ কিলোমিটার একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় নজরদারিসহ অন্যান্য কর্মতৎপরতার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এখনো প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

চলমান ঘটনা সমূহের নিরীখে সমুদ্র শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা

সাম্প্রতিককালে সমুদ্র এলাকায় সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা আমাদের শান্তিপূর্ণ সামুদ্রিক কার্যক্রমকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করছে। এ ধরনের কিছু ঘটনা আমাদের সামুদ্রিক নিরাপত্তায় বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলেছে, যা জাতিগতভাবে আমাদের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করার জন্য সমুদ্রে সামষ্টিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও নিশ্ছিদ্র ও কার্যকর করার অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে কারণে নিরাপদ সমুদ্রপথ নিশ্চিত করাসহ সমুদ্র সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থাদি আরও সুসংহত ও গতিশীল করার জন্যও আমাদের জলসীমানায় কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উচিত সে বিষয়ে নিচে আলোকপাত করা হলো:

ক। **বাংলাদেশের জলসীমা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা অবৈধ গমন প্রতিরোধকরণ।** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল কক্সবাজার থেকে টেকনাফ উপকূলে সীমান্তবর্তী দেশ মায়ানমার হতে স্থানীয় দাঙ্গার কারণে প্রচুর পরিমাণে রোহিঙ্গা শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অবৈধ এ প্রবেশ বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা। জাতীয় এ সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যগণ সকল প্রতিকলতার ঊর্ধ্বে থেকে অবৈধ রোহিঙ্গা

অনুপ্রবেশ দমনে সর্বদা তৎপর রয়েছে এবং এ পর্যন্ত এ বাহিনী কর্তৃক ১০৬৪ জন শরণার্থীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করানো সম্ভবপর হয়েছে। এ সমস্যা বিবেচনা করে কক্সবাজার হতে টেকনাফ উপকূলে কোস্ট গার্ডের ঘাঁটি ও জনবল বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অবস্থান শক্তিশালী করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

খ। **বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ প্রতিরোধ ও জলসীমা ব্যবহারকারী ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ**। বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ জনগণ মৎস্যজীবি পেশার সাথে জড়িত। প্রায় ১৭৪ টি ফিশিং ট্রলার ও আনুমানিক ৬৮,০০০ মেকানাইজড ও নন মেকানাইজড বোট সমূদ্রে মৎস্য আহরণ পেশায় নিয়োজিত রয়েছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন টন মৎস্য সম্পদ আহরিত হয়। এমতাবস্থায় দেশের এ বিশাল জনগোষ্ঠি এবং মৎস্য সম্পদ আহরণে নিয়োজিত বোটসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যাতে করে এ বাহিনী মৎস্যজীবি মানুষের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করতে পারে।

গ। **নিরাপদ সমুদ্র পথ নিশ্চিতকরণ**। অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক হওয়ায় বর্তমানে সমুদ্র পরিবহন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই পৃথিবীর সকল দেশ নিরাপদ সমুদ্র পথের নিশ্চয়তা বিধান করছে। যে সকল স্থানে এ নিরাপত্তা সুরক্ষিত সেখানে সমুদ্র চলাচল বিস্তৃত ও ব্যাপক। ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত গতিশীল। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়েনের প্রয়োজনে নিরাপদ সমুদ্র পথ আবশ্যক এবং গণ নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত নিরাপত্তা বাহিনী।

ঘ। **সমুদ্র সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ**। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো সমুদ্রের দিকে ঝুঁকছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থলভাগে সম্পদ ঘাটতি প্রতীয়মান হচ্ছে। ফলে উন্নত দেশসমূহ সমুদ্রের বিশাল সম্পদ ভাণ্ডারের দিকে বাড়িয়েছে হাত। আর তাই আমাদের নিজস্ব সমুদ্র এলাকায় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে হলে একটি বলিষ্ঠ কোস্ট গার্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঙ। **প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যে অংশগ্রহণ করা এবং দূর্ঘটনা কবলিত নৌযান, মানুষ এবং মালামাল উদ্ধারকরণ**। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে দেশের উপকূলবর্তী এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেহেতু অতিদ্রুত দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনগণ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিকট থেকে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশা করে। সত্যিকার অর্থে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জনগণের প্রত্যাশা পূরণে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। উপরন্তু আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সমুদ্র এলাকাকে বিভিন্ন Search and Rescue (SAR) Region এ বিভক্ত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকেও এ ক্ষেত্রে তার জলসীমায় উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবিকভাবে এ দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, জলযান ও জনবলের ঘাটতির কারণে অদ্যাবধি কোন ধরণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

চ। **পর্যটন**। বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সমুদ্র কিংবা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাতে ব্যাপকভাবে পর্যটনের বিকাশ ঘটছে। ফলশ্রুতিতে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। উল্লেখ্য বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত এবং একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশে যদিও পর্যটনের বিকাশ ঘটছে তবে তা যদি আরো সুসংগত হয় তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রভাব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে সাগর উপকূলে পর্যটকদের নিরাপত্তায় আধুনিক কোস্ট গার্ডের কোন বিকল্প নেই।

ছ। **সুন্দরবন সংরক্ষণ**। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন বিভিন্ন জলদস্যু ও ডাকাত দলের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত। ইতিমধ্যেই কোস্ট গার্ড একক ও যৌথ অভিযানে একের পর এক বিভিন্ন কুখ্যাত জলদস্যু যেমন গামা বাহিনী, শহীদুল বাহিনী, মর্তুজা বাহিনী, রাজু বাহিনীর সদস্য আটক এবং নির্মূল করেছে। অতি সম্প্রতি র‍্যাব ও বিমান বাহিনীর সহায়তায় কোস্ট গার্ডের নেতৃত্ব ও পরিকল্পনায় ১৫ জন জেলেকে জলদস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু বিশাল সুন্দরবনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা কোস্ট গার্ডের পর্যাপ্ত সার্বক্ষণিক উপস্থিতি না থাকায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জলদস্যু বাহিনী তৈরি হয়ে

সুন্দরবনে অপকর্ম চালাচ্ছে। তাই প্রায় ৪১০০ বর্গ কিলোমিটার এর বিশাল সুন্দরবন এলাকা কঠোর নজরদারিতে আনয়ন এবং জলদস্যু বাহিনীর তৎপরতা দমনে সুন্দরবনে কোস্ট গার্ডের একটি আলাদা জোন স্থাপন, অত্যাধুনিক জাহাজ ও জলযান এবং জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কার্যক্রম

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অত্যন্ত ধীর গতিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী হতে প্রাপ্ত কয়েকটি অতি পুরাতন গান বোট ও রিভারাইন পেট্রোল বোট এবং কিছু সংখ্যক দ্রুতগতির বোটের সাহায্যে কোস্ট গার্ড তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। তবে কোস্ট গার্ডের উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ এলাকার তুলনায় এ কয়েকটি পুরোনো জলযান প্রয়োজনের তুলনায় অতি অপ্রতুল। তথাপি সীমিত জনবল ও জলযান ব্যবহার করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছে। বর্তমানে কোস্ট গার্ডের সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, উচ্চ মনোবল ও কর্তব্যপরায়ণতার কারণে বিভিন্ন অপারেশনে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে সকল দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে। দেশবাসী তথা নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী জনগণের কাছে কোস্ট গার্ড আজ এক আস্থা, নিরাপত্তা ও নির্ভরশীলতার প্রতীক।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাফল্যের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর অপারেশনাল কর্মকাণ্ড বর্তমান বছরে অনেক বেশি বেগবান হয়েছে এবং সাফল্যের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে আশাপ্রদভাবে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রায় ৩০২ কোটি টাকার অধিক অবৈধ দ্রব্য-সামগ্রী আটক করেছে যা ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ এই তিন বছরের আটককৃত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের যোগফলের সমান এবং ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি ছিল। ইতিমধ্যেই আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত প্রায় ৪৬০ কোটি টাকার মালামাল আটক করা হয়েছে। নিচের তুলনামূলক বার চার্টে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সাফল্যের একটি বছরওয়ারি প্রতিবেদন উপস্থাপিত হল:

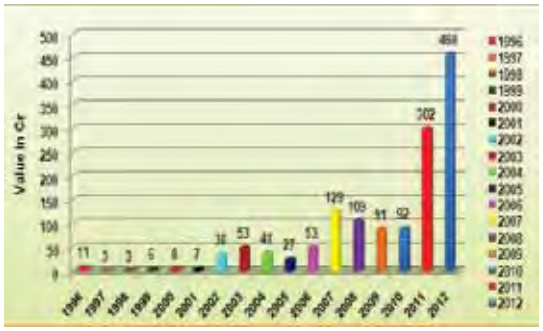

ক। চোরাচালান প্রতিরোধ। শুধুমাত্র চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০১১ সালে প্রায় ২৯ কোটি টাকার বিভিন্ন সামগ্রী আটক করেছে যা ছিল পূর্বের বছরের আটককৃত পণ্যের ৬ গুণ। এ বছরে আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত মোট ২৮.৪৫ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য ইতোমধ্যে আটক করা হয়েছে। চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশনের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে উপস্থাপিত হল:

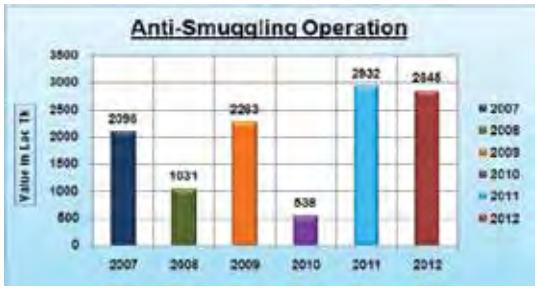

খ। মৎস্য সম্পদ রক্ষা। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে কোস্ট গার্ড ২০১১ সালে প্রায় ২৬২ কোটি টাকার ২৬০ মেঃ টন জাটকা/ইলিশ মাছ ও ২১ লক্ষ মিটার বিভিন্ন প্রকার অবৈধ জাল আটক করেছে যা পূর্বের ০৩ বছরের (০৩ বছরে অর্জিত সাফল্য সাড়ে ২২৯ কোটি) সম্মিলিত সাফল্যের যোগফলের চেয়েও বেশি। এ বছর আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত ৪২২.৩৪ কোটি টাকার ৮৬.৩২ মেঃ টন জাটকা, প্রায় ০৭.৮৩ কোটি মিটার বিভিন্ন প্রকার জাল আটক করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে উপস্থাপিত হল:

গ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অপারেশন পরিচালনা করে ২০১১ সালে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি টাকার মাদক আটক করে যার মধ্যে ইয়াবার পরিমাণ প্রায় ৭৯ হাজার। এ বছর আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রায় ৭.৮৭ কোটি টাকার মাদক আটক করা হয়েছে যার মধ্যে ০১ লক্ষ পিস ইয়াবা, ১২,৮৯৭ বোতল/ক্যান বিভিন্ন প্রকার মাদক ও ৬.১৫ কেজি গাঁজা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মাদক বিরোধি অভিযানের একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে উপস্থাপিত হল:

ঘ। জলদস্যুতা দমন ও অবৈধ অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার। সুন্দরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চলে জলদুস্যতা ও বনদস্যুতা দমনে গত ২০১১-২০১২ সালে কোস্ট গার্ডের অপারেশনে জলদস্যু আটক অবৈধ অস্ত্র, তাজা গুলি ও বিপন্ন জেলেদের উদ্ধারের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক্রমিক	*আটককৃত মালামাল*	২০১১	২০১২
ক।	কুখ্যাত জলদস্যু (নিহত)	১০ জন	০৩ জন
খ।	জলদস্যু	৪৫ জন	১৫৪ জন
গ।	অবৈধ অস্ত্র	৪৮ টি	৪৪ টি
ঘ।	তাজা গোলা	২৩৬ রাউন্ড	৩১২ রাউন্ড
ঙ।	বিপন্ন জেলে উদ্ধার	৬৬ জন	৩৬ জন

ঙ। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বিশেষ কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে বাণিজ্যিক জাহাজসমূহে ছিচকে চুরির ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ReCAAP (Regional Co-operation Agreement on CoMYating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Aisa) এর ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে ছিচকে চুরির ঘটনা পূর্বের বছরের চেয়ে শতকরা ৫০% কমে গেছে বলে উল্লেখ করেছে। এ রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে:

"The improvement reported in 2011 was most evident in the South Asian region mainly in the port of Chittagong, Bangladesh, while that in the Southeast Asian region has remained fairly consistent when compared with 2010. The number of incidents at the port of Chittagong has decreased by 50% in 2011, the lowest number reported since 2008".

এ উন্নতির কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেছে:

"There has been a significant improvement in the situation of the port of Chittagong in 2011 compared to 2008-2011. The Bangladesh Coast Guard and other maritime agencies had enhanced the security at the port of Chittagong".

এছাড়া কোস্ট গার্ডের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুতা ও ডাকাতি প্রবণ এলাকা হিসেবে বাংলাদেশের দুর্নাম ঘুচেছে। যার প্রমাণস্বরূপ সম্প্রতি International Maritime Bureau (IMY) কর্তৃক বাংলাদেশি সমুদ্র বন্দরদ্বয়কে জলদস্যুতার উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বন্দরের তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া অনলাইন জার্নাল ডিফেন্স ওয়েব এবং ICC কমার্শিয়াল ক্রাইম সার্ভিসেস তাদের ওয়েব সাইটে এ বছর ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশি বন্দরসমূহে জলদস্যুতা/ছিচকে চুরি হ্রাস পাওয়া সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বলা হয়:

"In South East Asia and the Indian subcontinent, vessels in Bangladesh reported 10 incidents of armed robbery in the approaches to Chittagong. This is a significant reduction from the 23 incidents reported in 2010 and reflects the initiatives taken by the Bangladesh Coast Guard to curb piracy in their water."

উপসংহার

জনসংখ্যার তুলনায় স্থলভাগ খুবই সীমিত হওয়ায় সমুদ্রের উপর নির্ভরশীলতার কোন বিকল্প নেই। আর এ বাস্তবতার নিরীখেই আমাদের সমুদ্র সীমানায় নজরদারি

বাড়ানোসহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড গঠিত হয়। অর্পিত দায়িত্বের তুলনায় জনবল এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি খুবই অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও কোস্ট গার্ড জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অকৃত্রিম দেশপ্রেমের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক সংস্থা ReCAAP এবং IMY কর্তৃক কোস্ট গার্ডের চলমান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমাদের সমুদ্র এলাকায় সংঘটিত কয়েকটি স্পর্শকাতর ঘটনা এবং 'ইটলস' এর মাধ্যমে সমুদ্র বিজয়ের ফলে আমাদের সমুদ্র এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ কর্তৃত্ব বজায় রাখার কোন বিকল্প নেই। আর এ জন্য উপকূল তথা সমুদ্র এলাকায় নজরদারির দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে প্রয়োজনীয় জলযান, জনবল, অবকাঠামো এবং গভীর সমুদ্রে টহলদানে সক্ষম বড় জাহাজ প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হলেই কেবল মাত্র আমাদের সমুদ্র এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ পুরোপুরি কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে। আমাদের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার হওয়ায় যেকোন অশুভ শক্তির হাত হতে তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদের সমুদ্র এলাকার গুরুত্ব অনুধাবন করে কোস্ট গার্ডের চলমান কর্মকাণ্ড ও সাফল্য বিবেচনায় এনে কোস্ট গার্ডকে শক্তিশালী করা সম্ভব হলে আমাদের সমুদ্র এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ নজরদারি বাড়ানোর বিষয়টি অনেকাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

রিয়ার এডমিরাল কাজী সারোয়ার হোসেন, (ট্যাজ), (সিডি), এনসিসি, পিএসসি, বিএন Britannia Royal Naval College, UK হতে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর Seal Training School হতে Underwater Demolition Training সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীতে ভারতীয় নৌবাহিনীর ASW School, Kochi হতে Anti Submarine Warfare এর উপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ ওয়েলিংটন, ভারতের একজন গ্র্যাজুয়েট। এডমিরাল সারোয়ার Edward University, USA হতে MBA এবং University of Madras, India হতে MSc ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৯৯ সালে US Naval War College হতে Naval Command Course সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি নৌবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি ও যুদ্ধ জাহাজে অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি কমডোর কমান্ডিং, খুলনা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ) ডাইরেক্টর অব সিভিল এন্ড মিলিটারি রিলেশনস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ চাকুরি জীবনে তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য পেশাগত প্রবন্ধ রচনা করেন যা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও জার্নালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার ঃ স্বনির্ভরতার পথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম কামরুল এহ্সান, এনডিসি, পিএসসি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মাত্র তিনটি বিমান নিয়ে স্বতন্ত্র বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতি অল্প পরিসরে একটি বাহিনীকে সংগঠিত করে বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন তা বিশ্ববাসীর কাছে সর্বস্বীকৃত। সময়ের বিবর্তনে স্বাধীনতার ৪১ বছর পর বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি পরিণত ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে ১৬০টিরও অধিক বিমান পরিচালনা করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী স্বল্প সংখ্যক দেশের মধ্যে অন্যতম যেখানে চতুর্থ প্রজন্মের বিমান মিগ-২৯ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার বিরল কৃতিত্ব তার রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চীনের নির্মিত বিভিন্ন সিরিজের এফ-৭ যুদ্ধবিমান, এ-৫ যুদ্ধবিমান, এফটি-৬ যুদ্ধবিমান, পিটি-৬ প্রশিক্ষণ বিমান; চেক প্রজাতন্ত্রের নির্মিত এল-৩৯ প্রশিক্ষণ বিমান, ইউক্রেনের নির্মিত এএন-৩২ ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত সি-১৩০ পরিবহন বিমান প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এমআই-১৭, এমআই-১৭১SH ও বেল হেলিকপ্টার দেশের প্রয়োজনে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ কাজে (ভিভিআইপি/ভিআইপি, রিলিফ) উড্ডয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব বিমান ও হেলিকপ্টারসমূহ বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেমন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসহ আন্তর্জাতিক Disaster Relief Operation কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমান/হেলিকপ্টার পরিচালনা ছাড়াও আকাশ প্রতিরক্ষার কাজে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক র‍্যাডার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত Surface to Air Missile (SAM) সিস্টেমের মাধ্যমে আমাদের বিমান বাহিনী শত্রুপক্ষের বিমান বা মিসাইলকে স্বল্প দূরত্বে আকাশেই ঘায়েল করার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

এসব অতি মূল্যবান সরঞ্জামসমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ বিমান বাহিনীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বাৎসরিক বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসব সরঞ্জামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশিক্ষণের কাজে ব্যয় হয়। বিমান বাহিনীর কারিগরি শাখার কর্মকর্তা ও বিমানসেনাগণ তাদের মেধা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব অত্যাধুনিক সরঞ্জামসমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করে এর কার্যোপযোগিতা নিশ্চিত করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত প্রায় ২৫ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত বেল হেলিকপ্টারের ওভারহলিং এর কাজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ২০৮ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটে সম্পাদিত হয়ে আসছে। এ ইউনিটটি ১৯৮৬ সালে চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৬৬টি বেল-২১২ হেলিকপ্টার ও ১২টি বেল-২০৬ হেলিকপ্টারের ওভারহলিং এর কাজ সম্পন্ন করেছে। এখানে ওভারহলিং এর পর হেলিকপ্টারগুলো ৮০,০০০ ঘণ্টা উড্ডয়নের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণে স্বনির্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি বিমান উড্ডয়ন নিরাপত্তায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশে নিজস্ব টেকনিশিয়ানদের দ্বারা ওভারহলিং এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় বিগত ২৫ বছরে আনুমানিক ৪৭৬.৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। অধিকন্তু, এ ইউনিটে ওভারহলিং এর পর ২১টি হেলিকপ্টার জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে প্রায় ১৮,০০০ ঘন্টা উড্ডয়নের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেসিক প্রাইমারি ট্রেইনার হিসেবে ১৯৭৭ সাল থেকে পিটি-৬ বিমান ব্যবহার করে আসছে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রথমবারের মত ২১০ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে পিটি-৬ বিমানের ওভারহলিং এর সক্ষমতা অর্জন করে। পূর্বে এ বিমানসমূহ চীন হতে ওভারহলিং করা হতো এবং এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হতো। ২১০ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯০টি পিটি-৬ বিমানের ওভারহলিং এর কাজ সম্পন্ন করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী এ প্রশিক্ষণ বিমানের রক্ষণাবেক্ষণে স্বনির্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি প্রায় ৪৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে।

বিমান বাহিনীর যে কোন অত্যাধুনিক সরঞ্জামের জন্য ইলেকট্রনিক্স একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিমান বাহিনীর ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৮২ সালে ২০৫ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট গঠিত হয়। এরপর থেকে এ ইউনিটের মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন

ধরনের ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম উদ্ভাবন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত অধিকাংশ সরঞ্জামই উন্নত এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। বর্তমান বিশ্বে প্রতিনিয়তই এসব প্রযুক্তির উন্নতি সাধিত হচ্ছে। তাই সর্বশেষ প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় ঘটিয়ে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জামের কার্যোপযোগিতা নিশ্চিত করা এবং এগুলোর উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণে স্বনির্ভরতা অর্জন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এজন্য প্রয়োজন এমন কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল ও একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের সর্বদা বিকাশমান উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিমান বাহিনী তথা সার্বিকভাবে বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে। বর্তমানে বিমান বাহিনীতে রয়েছে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারিগরি জনবল। কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিমানসেনাদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও সিলেবাসে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে কারিগরি প্রশিক্ষণার্থীগণ আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধে অধিকতর সম্যক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। যার প্রতিফলন ইতোমধ্যেই বিমান বাহিনীতে দৃশ্যমান। বিগত কয়েক বছর ধরে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামের বিদেশে ওভারহলিং এর সময় একটি কারিগরিদল সেখানে উপস্থিত থেকে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছে। এর ফলে কর্মকর্তা ও কারিগরি পেশার বিমানসেনাদের সমন্বয়ে একটি সুদক্ষ কারিগরি দল বিমান বাহিনীর অত্যাধুনিক সরঞ্জাম যেমন বিমান, হেলিকপ্টার, বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন, র‍্যাডার ইত্যাদির ওভারহলিং বিষয়ে ইতোমধ্যেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে। দেশে বিদেশে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমানসেনাদের দক্ষতা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। বিগত প্রায় ১৮ বছর ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে নিয়োজিত হেলিকপ্টার ও বিমানের প্রায় শতভাগ কার্যপোযোগিতা নিশ্চিতকরণে বিমান বাহিনীর কারিগরি ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত প্রতিটি সদস্যের সততা, নিষ্ঠা, নিরলস পরিশ্রম ও দক্ষতা জাতিসংঘের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, বিমান বাহিনী তথা দেশের এভিয়েশন সেক্টর নেতৃত্ব বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিমান বাহিনীর কারিগরি জনবল সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে।

পৃথিবীর যেসব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বিগত সময়ে এভিয়েশন সেক্টরে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে সুদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে Hindustan Aeronautical Limited (HAL) এর উদ্ভব হয়েছিল ১৯৬৪ সালে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। সময়ের বিবর্তনে আজ HAL বিশ্বের দরবারে এভিয়েশন সেক্টরে একটি সাফল্যের মাইলফলক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। যাত্রা শুরুর মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে HAL ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য Primary Trainer HPT-2 Deepak নামে একটি বিমান প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। HAL এর সাফল্যগাথা ইতিহাসের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ৩,৬৫৮টি বিমান/হেলিকপ্টার ও ৮,১৭৮টি ইঞ্জিন প্রস্তুতকরণ, ২৭২টি বিমানের Up-gradation এবং ৯,৬৪৩টি বিমান ও ২৯,৭৭৫টি ইঞ্জিনের ওভারহলিং। বর্তমানে HAL এর বার্ষিক টার্নওভার ১৯,১১৬ কোটি রুপি এবং বার্ষিক মুনাফা ২,৮৪০ কোটি রুপি। একইভাবে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশ ব্রাজিলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬৯ সালে EMBRAER নামক এভিয়েশন কোম্পানি গঠিত হয়। গঠনের পর মাত্র ১১ বছরের মধ্যে EMB312 Tucano নামে Basic Primary Trainer বিমান তৈরি করতে সমর্থ হয়। এ বিমানটি ইতোমধ্যেই বর্তমান সময় পর্যন্ত অন্যতম সফল Basic Primary Trainer বিমান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, যা পৃথিবীর প্রায় ১৫টি দেশের বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর মধ্যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য অন্যতম। EMBRAER এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৯২টি দেশের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৫০০০টি বিমান তৈরি করেছে। একই ধরনের সাফল্যগাথার ইতিহাস আছে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এভিয়েশন সেক্টরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তার কারিগরি দলের দক্ষতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটি এভিয়েশন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন বহুদিন ধরে লালন করে আসছে। এভিয়েশন সেক্টরে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে চীনের সহায়তায় প্রথমবারের মত যুদ্ধবিমানের ওভারহলিং এর কাজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এফ-৭ ওভারহলিং Plant এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। বর্তমানে এ ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলছে এবং ইতোমধ্যেই প্রথম যুদ্ধবিমানের ওভারহলিং এর কাজ এখানে শুরু হয়েছে। এখানে যেসব সরঞ্জাম ব্যবহৃত হবে সেগুলো দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিমান

বাহিনীতে ব্যবহৃত বিমান ও হেলিকপ্টারের যন্ত্রাংশের একটি উল্লেযোগ্য অংশ দেশেই তৈরি করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত অধিকাংশ যুদ্ধবিমান চীন হতে সংগৃহীত। তাই আশা করা যায় আগামী ১০ বছরে এ ইউনিটের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমানের ওভারহলিং এর কাজ করার মাধ্যমে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। তাছাড়াও বর্তমান অর্থবছরে এমআই-১৭ ওভারহলিং Plant বাংলাদেশে স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে বর্তমানে যেসব ওভারহলিং ইউনিটসমূহ চালু রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যেসব ওভারহলিং ইউনিটের কাজ শুরু হবে (যেমন এমআই-১৭ ওভারহলিং Plant) সেগুলোকে একটি স্বতন্ত্র সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখ Bangabandhu Aeronautical Centre (BAC) নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রাথমিকভাবে BAC এর উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ২০৮ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (বেল হেলিকপ্টার ওভারহলিং ইউনিট), ২১০ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (পিটি-৬ বিমান ওভারহলিং ইউনিট), ২০৫ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম ওভারহলিং ইউনিট), ২০৩ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (গোলাবারুদ ওভারহলিং ইউনিট) এবং ২১৪ রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট (এফ-৭ ওভারহলিং ইউনিট)। এসব ইউনিটসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং Capacity Building এর মাধ্যমে আরো বড় পরিসরে জাতীয় পর্যায়ে Aviation Sector এর উন্নতি সাধন করাই BAC গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। BAC এর মাধ্যমে দেশের এভিয়েশন সেক্টরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিগত ৪০ বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য উন্নয়নশীল কিছু দেশের মত জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী BAC এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা স্থির করেছে। এছাড়া কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিমান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে Joint Venture এর মাধ্যমে আগামী ১০ বছরের মধ্যে একটি Basic Primary Trainer তৈরির প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে।

এদেশে তৈরিকৃত Basic Primary Trainer প্রশিক্ষণ বিমান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে রপ্তানি করা যাবে এবং আয় করা যাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। বাংলাদেশে বেসরকারি বিমান পরিবহন খাতে বিগত কয়েক বছরে প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীসহ অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনী যেমন র‍্যাব, পুলিশ ইত্যাদিতেও হেলিকপ্টার/বিমানের ব্যবহার আগামী দিনে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীসহ দেশের বেসরকারি বিমান পরিবহন সংস্থাগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে BAC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে Military Institute of Science and Technology (MIST) তে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন ও উচ্চশিক্ষায় গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও BAC কে ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অনুরোধে সাড়া দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার BAC গঠনের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ইতোমধ্যেই BAC এর সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করার প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য BAC কে একটি আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এর মাধ্যমে দেশের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সকল দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী BAC কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিমান আমাদের আকাশে উড়িয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম কামরুল এহ্‌সান, এনডিসি, পিএসসি ১৯৮৬ সালের ১৫ জুন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (যন্ত্রকৌশল) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি মিরপুর ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড ও স্টাফ কলেজ হতে স্টাফ কোর্স এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর হতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স সম্পন্ন করেন। চাকুরি জীবনে তিনি বিমান বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি ও বিমান সদরে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এডিএ (এয়ার) হিসেবে চীনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিমান সদরে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় নবপ্রজন্ম

ক্যাপ্টেন খান সজিবুল ইসলাম, আর্টিলারি

ভূমিকা

যে স্বপ্নের প্রদীপ একদা বুনন করে দিয়েছে বাংলার সূর্য সন্তানেরা, তার দৃপ্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম আজ মানব ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রূপে পরিগণিত। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা এ সংগ্রামেরই সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এর চেয়ে গৌরবজনক ঘটনা আর নেই। স্বাধীনতার স্বপ্ন সে চিরকাল দেখে এসেছে। কিন্তু এই প্রথম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতি সুসংহত কর্মোদ্যম ও ঐক্যের পরিচয় দিয়ে নিদারুণ রক্তমূল্যে আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। পাকিস্তানি শাসন শোষণের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রাম বাঙালির বহুকালের সংগ্রামের ইতিহাসে এক সার্থক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাই একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম যে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একবিংশ শতাব্দির নতুন প্রজন্ম পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের ফলে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনার পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান, যা জাতি হিসেবে আমাদের কাছে হতাশাজনক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে স্বাধীনতার চেতনা ছড়িয়ে দিয়ে তাকে পরিশীলিত চর্চার মাধ্যমে সকলকে দেশ প্রেমে বলিয়ান করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই নব প্রজন্ম স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে অগ্রসর হবে দীপ্তিময় উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ শিখরে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

নিঃসন্দেহে একাত্তরে আপামর বাঙালি একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের জন্য যে জীবনপণ যুদ্ধে নেমেছিল তাতে রাজনৈতিক চেতনারই প্রাধান্য ছিল। তবে সে চেতনারও বাস্তব ভিত্তি ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নেরও দৃঢ় আর্থ-সামাজিক পটভূমি ছিল। বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্খা একদিনে গড়ে ওঠেনি। এ সাধনার পেছনে মূলত যেসব আকাঙ্খা কাজ করেছে, সেগুলোর মধ্যে আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিরাপদ জীবনযাপনের ইচ্ছেটিই ছিল প্রধান। তাই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর নির্বাচন, ষাটের দশকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন এবং সর্বশেষে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ভালোভাবে খেয়ে পরে জীবনের উৎকর্ষ সাধনের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে মোটেও দ্বিধা করেনি।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালি নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কাঠামো পরিচালনার মাধ্যমে এসব আকাঙ্খা বাস্তব রূপায়ণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার ফলে বেশিরভাগ মানুষ সত্যি সত্যি একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়ের ব্যাপারে অনেকটাই সন্দেহমুক্ত হতে থাকেন। যার ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ একাত্ম করেছিল সমগ্র জাতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। যার বহিঃপ্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর এর চূড়ান্ত বিজয়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম

নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলিয়ান করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক। **নতুন নীতিমালা প্রণয়ন**। বর্তমান সরকার নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস উপস্থাপনার জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা নব প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা আমাদের সবার পবিত্র দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে নীতিমালার আওতায় থাকবে সঠিক এবং নির্ভুল তথ্য। এ ক্ষেত্রে সংগৃহীত নীতিমালাকে স্থায়ী রূপ দিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন ঘটনাবলীকে পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে যাতে তারা সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয় এবং একই সাথে বুঝতে পারে আমরা কতটা আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ছাত্র/ছাত্রীদের সকল শিক্ষার ভিত্তি যেন হয় দেশপ্রেম। সরকারি নীতিমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিভিন্ন স্কুল ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও ভাস্কর্য যা দেখে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার জন্য নতুন প্রজন্মের মাঝে আগ্রহ তৈরি হবে। যে আগ্রহ থেকে তারা জানতে চাইবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। সুতরাং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করার জন্য সরকার এবং জনসাধারণকে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে। সাথে সাথে সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রকাশ, প্রদর্শন ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ। **বই পড়ার অভ্যাস।** বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যাতে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদের অন্তরে ধারণ করতে পারে। এ জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকার ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের বই বিতরণ করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে বই। তাই নতুন প্রজন্মকে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বই এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে সুন্দর ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তাদের সুকৌশলে এবং আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রদানের নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যাতে নতুন প্রজন্মের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হয়। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের বই নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে। এজন্য পর্যাপ্ত লাইব্রেরি গড়ে তুলতে হবে কেননা লাইব্রেরি হচ্ছে সুশীল সমাজের প্রধান আশ্রয়স্থল।

গ। **সভা সমিতির আয়োজন।** সভা সমিতির আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস, পটভূমি, মহৎ চেতনা এবং ঘটনা প্রবাহ নতুন প্রজন্মের কাছে নিশ্চিতভাবে পৌঁছে দিতে হবে। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক ধারণা দেয়ার জন্য বিভিন্ন দিবস এবং অনুষ্ঠানে সভা সমিতি বা মুক্ত আলোচনার আয়োজন করতে হবে যার একমাত্র বিষয় থাকবে মুক্তিযুদ্ধ এবং এর চেতনা। বিভিন্ন দিবসগুলোতে ঐ দিনের তাৎপর্য অনুযায়ী নতুন প্রজন্মের জন্য সভা সমিতির আয়োজন করতে হবে, যে সভার আলোচনার একমাত্র বিষয় হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এতে নতুন প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে, আমরা জাতি হিসেবে কতটা সংগ্রামী ও ত্যাগী। নতুন প্রজন্ম যেন এ চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশপ্রেমে এগিয়ে আসে। সভা সমিতির আয়োজনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে আমাদের নতুন প্রজন্মকে সচেতন করে তোলা এবং পাশাপাশি দেশপ্রেম ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তবেই সভা সমিতির আয়োজন সার্থক এবং সফল হবে। নিম্নোক্তভাবে সভা সমিতির আয়োজন করা যেতে পারে:

(১) স্কুলের শিক্ষকরা তাদের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আলাদা ক্লাস ও আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারেন।

(২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক ইউনিয়ন পর্যায়ে সভা সমিতির আয়োজন করা।

(৩) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা।

(৪) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।

(৫) স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানো।

ঘ। **সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন।** স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য কোন দলিল এখনও উপস্থাপন করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। সঠিক ইতিহাস জাতির দর্পন স্বরূপ। একটি জাতির ঐতিহ্য কত বেশি বা জাতি হিসেবে কতটা সমৃদ্ধশালী তা বোঝা যায় সেই জাতির সুস্পষ্ট ইতিহাস দেখে। তাই নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানো অত্যন্ত জরুরি। কেননা এ ইতিহাসের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম তার দেশের পুরোনো গৌরব, সংগ্রামি ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে। বিশ্বের মানচিত্রে ক্ষুদ্র এ দেশটি গৌরবের সাথে টিকে আছে দেশটির সংগ্রামি ইতিহাসের মাধ্যমে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, জাতীয় লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে অবহিত করা জরুরি। কারণ নতুন প্রজন্মই আগামীর বার্তাবাহক।

ঙ। **পরিদর্শন বা ভ্রমণ।** পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভ্রমণের সুযোগ বা ব্যবস্থা করে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেমের তাৎপর্য তুলে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের উপর বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধ একটি সুন্দর ও সঠিক ইতিহাস হয়ে থাকে। তারা যেন এর বীরত্ব গাঁথা ও ত্যাগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের স্বাক্ষীস্বরূপ

বিভিন্ন স্থানে স্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আরো বেশি উৎসাহিত হবে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য। শুধু তাই নয় এ শিক্ষা আরো বেশি ফলপ্রসু হবে–যা তাদের মধ্যে মূল্যবোধ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সুতরাং ভ্রমণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা যেতে পারে।

চ। **মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রদর্শনী।** প্রত্যেক জেলা সদর কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে ২/৩ দিনের জন্য মুক্তিযোদ্ধা এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে মতবিনিময় দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত এবং ব্যবহারিক জ্ঞান নব প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যেতে পারে যাতে ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনে তাঁরাও নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে। এ সকল প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্থানের মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে মঞ্চায়িত নাটক নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে যা তাদের কাছে বাস্তব ও অনুপ্রেরণার বিশেষ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। সরকার এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা একাডেমির উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র বা উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে।

ছ। **ইলেকট্রনিক মিডিয়া।** বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রামাণ্য চিত্র ও তথ্য উপস্থাপন করে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র ছাপাতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে এ পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং চলচিত্র তৈরি করা হয়েছে। যা আরো সঠিক ও মানসম্মত করা যেতে পারে। মিডিয়ার মাধ্যমে মূলত নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন চ্যানেলে সঠিক সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে যাতে শিশু-কিশোর এ অনুষ্ঠানটি দেখার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবার তাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে একত্রে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে হবে। বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান তৈরির জন্য মিডিয়া শিল্পিদের নিজ উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে--যা হবে বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী। তাই মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের সংগ্রামী অতীতকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

জ। **জাদুঘর/যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা।** সরকার কর্তৃক জাদুঘর/যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ অথবা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও মহৎ চেতনা পৌঁছে দেয়া যেতে পারে যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নবীন প্রজন্মের কাছে আরও জীবন্ত ও স্পষ্ট হয়। কারণ যে জাতি ইতিহাসের যত মূল্যায়ন করবে সে জাতি ততই উন্নতি লাভ করতে পারবে।

ঝ। **বধ্যভূমি ও সম্মুখ সমর স্থান সংরক্ষণ।** সরকার কর্তৃক বধ্যভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমর স্থান সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন ও নতুন প্রজন্মকে এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সাহসী এবং সর্বোচ্চ ত্যাগের নিদর্শন তুলে ধরে তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

ঞ। **স্মারক ও ভাস্কর্য নির্মাণ।** মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ, তাদের আত্মত্যাগ নব প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। বিভিন্ন সরকারি ভবন, প্রতিষ্ঠান চত্বর, লাইব্রেরি, জাদুঘর, খেলাঘর ইত্যাদির নামকরণ মুক্তিযোদ্ধাদের নামে করা যেতে পারে। এ সকল স্মারক এবং ভাস্কর্য দেখে নবপ্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ অন্তরে ধারণ করতে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ এবং সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনা ও গেইট বীর যোদ্ধাদের নামে নামকরণ করা যেতে পারে। এসব স্থাপনাগুলো নব প্রজন্মের কাছে গর্বের বিষয় হিসেবে বিবেচিত এবং একই সাথে নবপ্রজন্ম ব্যক্তিত্ব গঠনে এ সব মহামানবদের অনুসরণ করার সুযোগ পাবে।

ট। **বর্তমান সময়ের প্রজন্ম।** বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, বিশ্বায়নের যুগ। প্রতিটি জাতিই এ তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে এবং ব্যবহারে খুবই সচেতন। ফলে নতুন প্রজন্ম হয়ে পড়েছে প্রযুক্তি নির্ভর। এ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের শিকড়ের সাথে পরিচয় করে দিতে হবে এবং এ মহান দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাদেরকে জানাতে হবে তার পূর্বপুরুষের বীরত্বগাথা ইতিহাস। সুতরাং বিজ্ঞানের যুগ বা আধুনিক যুগ যাই বলি না কেন আধুনিকতা আনতে হবে আমাদের চিন্তা, চেতনায় ও মনে। স্বাধীনতার সোনার ফসলকে কোনভাবেই বৃথা যেতে দেয়া যাবে না। নতুন প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানাতে

হবে। তাদের করণীয় কি তা আমাদের বোঝাতে হবে। তবেই তাঁরা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক নতুন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদেরকে রক্তক্ষয়ী নয় মাস সংগ্রামের কথা জানাতে হবে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের সকলের উচিত স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে আলোকিত করা।

ঠ। **নবপ্রজন্ম এবং চেতনা ও মূল্যবোধ।** মানুষের স্বতন্ত্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে চেতনা এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে। চেতনা ও মূল্যবোধ মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, আস্থা ও বিশ্বাস। নব প্রজন্মের চেতনা ও মূল্যবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব সকলের। এক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। নবপ্রজন্মকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং মূল্যবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হবে। স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনা অন্তরে ধারণ করতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাভূমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি এ মাটির সন্তান, এ চিরন্তন সত্যকে নব প্রজন্মের অন্তরে ধারণ করতে হবে। প্রতিটি নবীনের অন্তরে দেশপ্রেম ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে থাকবে মহান মুক্তিযুদ্ধ।

ড। **নবপ্রজন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধ।** আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার সংগ্রামী আত্মত্যাগের ইতিহাস নব প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। যাতে নবপ্রজন্ম স্বাধীনতার সংগ্রামী ইতিহাসকে ভিত্তি করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বইমেলা, সমরাস্ত্র প্রদর্শনী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা, স্কুল-কলেজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নবপ্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুষ্ঠান বা সভার আয়োজন করতে হবে যেন প্রতিটি বাঙালির জীবন গঠনের মুলভিত্তি হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। তবেই আমরা একটি আদর্শ স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করতে পারব।

ঢ। **নবপ্রজন্ম এবং স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস।** ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মোৎসর্গ আর অসংখ্য মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার পরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজ পতাকা বাঙালির অহংকার। তাই স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অধ্যায় নব প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ', 'চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু', 'আমাদের বঙ্গবন্ধু' নামক প্রামাণ্য চলচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা--নবপ্রজন্মকে স্বাধীনতা সম্পর্কে উজ্জীবিত করছে এবং নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে জানতে পারছে। বিভিন্ন স্কুল/কলেজ এবং সরকারি/বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এ সকল দিবসে একাত্ম হয়ে কাজ করতে হবে যাতে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানতে পারে।

ণ। **সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা।** স্বাধীনতা একদিনে অর্জিত হয়নি। দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং প্রতীক্ষার ফসল এ স্বাধীনতা। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন এবং একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা। নতুন প্রজন্মের কাছে সংগ্রামী ইতিহাসের সঠিক পটভূমি তুলে ধরতে হবে। ইতোমধ্যে 'সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা' প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। 'সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা' বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রদর্শন করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, জেলে, মেহনতি মজলুম জনতা সশস্ত্র বাহিনীর বীর সন্তানেরা বাঙালি জাতি হিসেবে একাত্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালে। জাতির পিতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। মূলত তারই বহিঃপ্রকাশ 'সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা'। নব প্রজন্মকে অবশ্যই 'সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা' অন্তরে ধারণ করতে হবে।

বিবিধ

এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মের বিকাশে প্রতিটি জেলায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর স্থাপন এবং তার যথাযথ ব্যবহার, মুক্তিযুদ্ধ মেলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান, ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘর ও লাইব্রেরি

স্থাপন, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনগাঁথা অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদায় সমাসীন। বাঙালির দুর্জয় মনোবল, সংগ্রামী চেতনা ও প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলেই বাংলাদেশের মুক্তির স্বপ্ন এক বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠতে পেরেছে। ২৬ মার্চ ২০১১ পালিত হলো স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পূর্তি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলার বীর দামালরা অংশগ্রহণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধে। এত কম সময়ে এত রক্তে স্বাধীনতা অর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত বিশ্বের অনেক দেশ রয়েছে যাদের সংগ্রামের প্রায় ৪০/৫০ বৎসর পরেও অনিশ্চিত তাদের মুক্তির সোনালি সূর্যোদয়, সেই দিক থেকে বাংলাদেশ অনেক বেশি সৌভাগ্যবান, মাত্র নয় মাসে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু ভৌগোলিক সীমারেখা শুধুমাত্র একটি দেশের সামগ্রিক মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেনা। স্বাধীনতা রক্ষার এ মহান দায়িত্ব বর্তায় আমাদের সকলের উপর। এদেশের মাটি, ধুলিকণা, বায়ু আমাদের মায়ের মত আদর যত্নে গড়ে তোলে। সেজন্য এ মাটি ও দেশের প্রতি আমাদের গভীর মমত্ববোধ। দেশকে রক্ষার পাশাপাশি দেশের উন্নতি সাধন করা আমাদেরই কর্তব্য। যখন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ অর্থনীতি এবং দারিদ্র্যমুক্ত জনগোষ্ঠী নিশ্চিত করা যাবে তখনই জাতির সামগ্রিক মুক্তি নিশ্চিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। www.wikipedia.com

২। www.সচলায়তন.com

৩। www.banglablog.com

৪। পাঠ্যবই নবম ও দশম শ্রেণি

ক্যাপ্টেন খান সজিবুল ইসলাম, আর্টিলারি *২৪ জুন ২০০৯ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১০ জুলাই ২০০৯ তারিখে ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে এ্যাডজুটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।*

ভবিষ্যৎ বিশ্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা

কমডোর খন্দকার তৌফিকুজ্জামান, (সি), এনডিসি, পিএসসি, বিএন

ভূমিকা

নিরাপত্তা কোন দেশের বিভিন্ন স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। নিরাপত্তা বলতে বোঝায় নিরাপদ থাকার একটি উপলব্ধি যা 'ভয়হীনতা', 'নিরাপদ থাকার অনুভব', 'হুমকিহীন জীবন' অথবা 'একটি সংঘাতহীন পরিবেশের অনুভূতি'। জাতীয় রাজনীতি একটি নির্দিষ্ট গতিপথ দ্বারা বেষ্টিত যাতে জাতীয় লক্ষ্য পূরণ করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ধারাবাহিক সরকারগণ বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়েছেন। এ সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় অর্জনের একটি তালিকা হলো-- স্বাধীনতা, স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ, অর্থনৈতিক উন্নতি, অন্তসংঘাতমুক্ত দেশ এবং অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ঐক্য। জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে একটি বিশেষ পরিকল্পনা যেখানে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও লোকবলের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও জাতীয় লক্ষ্য সঠিকভাবে অর্জন করা যায়। এভাবে জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষানীতি ও দেশের আভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণে সমন্বয় সাধন করা যায়। সাধারণভাবে এখানে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, রাজনীতিবিদ, বিচারপতি ও বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশ্বরাজনীতির বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থ মন্ত্রণালয় বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জাতীয় অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করে এবং সামরিক ও বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করে। মন্ত্রিসভা, সংসদীয় কমিটি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জনগণের আকাঙ্খা এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, এনজিও এবং গণমাধ্যমের অংশগ্রহণে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয়।

জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণভাবে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

ক। বাস্তব এবং সঠিক দেশি/আন্তর্জাতিক উন্নতির উপায় প্রবর্তন।

খ। সম্পদের সঠিক ব্যবহার (সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক, জনশক্তি ও কারিগরি দক্ষতাসহ)।

গ। এ সম্পদ গ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানে এগুলোর প্রয়োগ করতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি।

ঘ। বিশ্বায়নের সাথে পারিপার্শ্বিক কর্মকাণ্ড যেমন- বিভিন্ন দেশের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা।

উপরে আলোচিত চারটি বিষয়ের দ্বারা ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করব যাতে অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় আমরাও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হুমকি ও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

বেশিরভাগ চিন্তাবিদগণ মনে করেন শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিশাল অর্থনীতি, ইউরোপ থেকে এশিয়ায় অর্থনৈতিক শক্তি স্থানান্তর এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ২০২৫ সালের মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে যা হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম। যুক্তরাষ্ট্র এখনও সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব কমছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি কঠিন দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে। তারপরও ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিরাজ করবে। যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এখনও পৃথিবীর সকল শক্তির সঞ্চয়কারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। চীন, ভারত ও অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্র উদ্ভবের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন মেরুকরণ হয়েছে। শক্তির দিক থেকে উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব আরও বেড়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে পাশ্চাত্য দুর্বল হচ্ছে এবং শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। চীন আগামী ২০ বছরে অন্য কোন রাষ্ট্র থেকে বেশি ভারসম্যপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যদি বর্তমান ধারা চলতে থাকে তবে ২০২৫ সালের মধ্যে চীন হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এবং সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি। চীন প্রাকৃতিক সম্পদের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারকও হবে। ভারতের অর্থনীতি দ্রুত ক্রমবর্ধমান এবং অনেকগুলো মেরুর মধ্যে নয়াদিল্লি একটি মেরু। রাশিয়ার ২০২৫ সালের মধ্যে ধনী, শক্তিধর এবং আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হবার সম্ভাবনা আছে। চীন, ভারত ও রাশিয়ার মত অন্য কোন দেশের ক্ষমতাধর হবার সম্ভাবনা নেই। তারপরও ধারণা করা হয় ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও তুরস্কের রাজনৈতিক শক্তি এবং দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক শক্তি বাড়বে।

বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক ক্ষমতা যেমন, ব্যবসা, ধর্মীয় সংগঠন, অপরাধী সংগঠন ইত্যাদি ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং আগামী ২০ বছরে এগুলো আরও বাড়বে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। উন্নত দেশের জনসংখ্যা, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি শক্তি, খাদ্য ও পানির স্বল্পতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কিছু দেশের উন্নয়নের গতি কমে যাচ্ছে। উনিশ শতকে যেমন অস্ত্র বিস্তার, ভৌগোলিক বিস্তার এবং সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তেমনি ভবিষ্যতেও ব্যবসা, বিনিয়োগ এবং কারিগরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে।

আন্তর্জাতিকভাবে সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিনিময় বিভিন্নভাবে চলছে এবং চলবে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনের অর্থনৈতিক অর্জন একত্রে ২০৪০-২০৫০ সালে বিশ্ব জিডিপি'র একটি বৃহৎ অংশ হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে কিছু দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার কয়েক ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে কিন্তু এতে গোটা জাতির ক্ষতি সাধন হয়। আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশ ভয়াবহভাবে অর্থনৈতিক ভাঙন, জনসংখ্যার চাপ, গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ভুগছে। ল্যাটিন আমেরিকা অর্থনৈতিক দিক থেকে এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় আগামী ২০ বছরে জনসংখ্যা অনেক বাড়বে। পাশ্চাত্যে জনসংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ কমবে। অনেক দেশে যুবকের সংখ্যা কমে যাবে কিন্তু অনেক দেশ যাদের যুবকের সংখ্যা বেশি তারা দ্রুত উন্নতি করবে। আফগানিস্তান, নাইজেরিয়া, ইয়েমেন ইত্যাদি যুবকবহুল দেশে যদি নাটকীয়ভাবে চলতি অবস্থার উন্নতি না হয় তবে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এরা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ইউরোপ ও জাপান এ দৌড়ে চীন ও ভারতকে হারিয়ে দেবে তাদের মাথাপিছু আয়ে কিন্তু তারা তাদের অধিক আয়ের জন্য সংগ্রাম করবে। কারণ তাদের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে। যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা সমস্যা অন্যান্য উন্নত দেশ অপেক্ষা ভালভাবে মোকাবেলা করতে পারবে তাদের উচ্চ জন্মহার ও অধিক অভিবাসনের কারণে।

ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে ২০২৫ সাল নাগাদ প্রায় ১২০ কোটি লোক খাদ্য, পানি ও জ্বালানি সমস্যায় পড়বে। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে ২০৩০ সালে বিশ্বে খাদ্যের চাহিদা প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ না থাকার কারণে করুণ অবস্থা বিরাজ করছে, বিশেষ করে কৃষি খাতে। দিন দিন সব গ্রাম শহরে পরিণত হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ৩৬ টি দেশের প্রায় ১৪০ কোটি মানুষ কৃষিজমি অথবা সুপেয় পানির অভাবে পড়বে। অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং প্রচলিত অন্যান্য জ্বালানি চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপরও আবহাওয়া পরিবর্তন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। কিছু স্থানে ক্ষতিকর প্রভাব কেবল শুরু হয়েছে, বিশেষভাবে খাবার পানির সংকট এবং কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়া। অনেক উন্নয়নশীল দেশে কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার ভায়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে, কারণ কৃষি তাদের অর্থনীতির একটি বিশাল অংশজুড়ে আছে এবং তাদের বেশিরভাগ জনগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু বিশ্ববাণিজ্য কোন সীমারেখার মধ্যে নেই এবং শ্রমবাজার অনেক বিস্তৃত তাই শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র যোগ্যতা যা দ্বারা উন্নতি করা সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত যাতে সমাজ সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোক পায় যারা সমাজ ও দেশকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে নিয়ে যেতে পারে। প্রযুক্তি, অভিবাসনের প্রভাব, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং আইন অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহ দিচ্ছে। এতে নিম্নমুখী অর্থনীতি, সামাজিক অবক্ষয় এবং সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কমবে।

সন্ত্রাস এবং সংঘাত এখনও অলোচ্য বিষয় যদিও সম্পদই এখন আন্তর্জাতিক আলোচনার প্রধান বিষয়। ২০২৫ সাল পর্যন্ত যেসকল সন্ত্রাসী গ্রুপ থাকবে; কারিগরী বিদ্যা এবং বৈজ্ঞানিক একটি বিপদজনক অংশ তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। চাকরির স্বল্পতা, রাজনীতির অপপ্রয়োগ, কৃত্রিম আচার-আচরণ, ক্রমবর্ধমান সংস্কারের প্রভাবে অনেক যুবক সন্ত্রাসী গ্রুপে যোগ দেবে। আমরা মনে করি আদর্শগত সংঘাত ও স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সামুদ্রিক নিরাপত্তার জন্য নৌ বন্দরকে আধুনিক করতে হবে। চীন ও ভারত তাদের সমুদ্র রক্ষায় নৌবাহিনীকে আধুনিক করেছে। গভীর সমুদ্রে অবকাঠামো নির্মাণ বিভিন্ন সংঘাত বৃদ্ধি করে। তারপরও এটা আন্তর্জাতিক সহায়তামূলক কর্মকাণ্ডে ও সমুদ্রসীমা রক্ষায় ব্যবহার করা যায়। যেহেতু এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না তাই পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। আগামী ২০ বছরে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিছু রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র বানানোর চেষ্টা করছে অথবা পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রি স্থাপন করছে অন্যরা পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে।

একমাত্র প্রযুক্তিগত জ্ঞানের মাধ্যমে এ সব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে আমাদের যে প্রযুক্তি আয়ত্বে আছে তা ভবিষ্যতের বাধা মোকাবেলা

করার জন্য যথেষ্ট নয়। সরকার ভিন্ন অন্যান্য সংস্থার ক্ষেত্রে দ্রুত বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়া সম্ভব নয়। এনজিও'র জন্য সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়া কোন প্রকল্প হাতে নেয়া কষ্টকর। নীতিনির্ধারকদের মতবিরোধ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাধা সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, বৈশ্বয়িক পরিবর্তনের ফলে আমাদের অনেক বাধাবিঘ্ন আসবে। এসব পরিবর্তন নতুন অবস্থা ও সংকটের সৃষ্টি করে উন্নয়নকে ভিন্ন পথে ধাবিত করবে। এগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। কিন্তু অনেক অনিশ্চয়তার সাথেও উন্নয়ন আমাদের অতীব প্রয়োজন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে যদি সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্ধারণ করা না হয় তাহলে আমাদের মত ক্ষুদ্র অনেক রাষ্ট্রকে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। এটা অবশ্যই মানতে হবে যে উপরে আলোচিত সব হুমকির বিরুদ্ধে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবশ্যই অনুমোদন করতে হবে যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এ ধরনের একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নির্দিষ্টকরণের জন্য একটি নিরাপত্ত কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীবর্গ, বিভিন্ন নিরপত্তা বাহিনীর প্রধানগণ, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যম ও এনজিও এর সমন্বয়ে এ ধরণের পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় যে কোন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে এ কাউন্সিল আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ পরিষদ জাতীয় নিরাপত্তা নীতির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রস্তাব করতে পারবে।

কমডোর খন্দকার তৌফিকুজ্জামান, (সি), এনডিসি, পিএসসি, বিএন *১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং যুগোশ্লাভিয়া থেকে বেসিক ট্রেনিং সমাপ্ত করে ১৯৮০ সালে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো ইউনিভার্সিটি হতে স্নাতক, পাকিস্তান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে এমএসসি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর এমডিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পাকিস্তান হতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স, জার্মানি হতে এডমিরাল স্টাফ কোর্স, মিরপুর হতে স্টাফ কোর্স, ভারত হতে কমিউনিকেশন স্পেশালাইজেশন কোর্সসহ দেশে ও বিদেশে আরও অনেক পেশাগত কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি আঞ্চলিক কমান্ডার ও ফ্ল্যাগ অফিসার হিসাবে কমডোর কমান্ডিং খুলনা ও নৌ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। কমডোর জামান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ) ডাইরেক্টর অব সিভিল এন্ড মিলিটারি রিলেশনস এর দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় সংবাদপত্র, ডিফেন্স জার্নাল ও সাময়িকীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার উপর তার একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি নৌ সদর দপ্তরে ড্রাফটিং অথরিটি হিসেবে নিয়োজিত আছেন।*

সেনাবাহিনীর সমসাময়িক উন্নয়ন ও দেশগঠনে এর ভূমিকা

মেজর দিলীপ কুমার রায়, এইসি

ভূমিকা

ভূমিকা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্ম। সেনাবাহিনীর জন্মলগ্ন থেকেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ, চৌকস ও যুগোপযোগী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। সে কারণেই জাতির পিতা স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ দক্ষ, অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও আদর্শ একটি বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। দায়িত্ব পালনে সেনাবাহিনীর দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও ত্যাগ স্বীকার দেশ তথা বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে এবং স্থান করে নিয়েছে সকলের হৃদয়ের গভীরে।

আধুনিকায়ন

প্রথমে সেনাবাহিনীর পাঁচটি ব্রিগেড থেকে পাঁটটি ডিভিশনে উন্নীত হয় এবং উপযুক্ত অস্ত্র ও সরঞ্জামাদিতে সমৃদ্ধি অর্জন করে। বর্তমানে আর্টডকসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রয়েছে সুসজ্জিত আটটি ডিভিশন যা যেকোন বহিঃশত্রু মোকাবেলা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যুক্ত আছে আর্মার্ড, এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারি, আর্মি এভিয়েশনসহ উন্নত প্রযুক্তির সামরিক ব্যবস্থাদি। এছাড়া উন্নত চিকিৎসা, প্রকৌশল ও লজিস্টিক সার্ভিসও সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে।

ফোর্সেস গোল-২০৩০ নির্ধারণ এবং এর বাস্তবায়ন সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নেরই একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক সেনাবাহিনী গঠনের প্রচেষ্টায় এটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরকরণে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এরই ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীতে জরুরি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির সংযোজন হয়েছে। আর্মার্ড কোর, আর্টিলারি ও পদাতিক বাহিনী এর আধুনিকায়ন ও ফায়ার পাওয়ার বৃদ্ধি করা এবং সচলতা বাড়ানোর জন্য অনেক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার্স, সিগন্যাল, এএসসি এবং অন্যান্য কোরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্যেও নেয়া হয়েছে বিস্তর পদক্ষেপ। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কাঠামো ও পদ্ধতি এবং সেই লক্ষ্যে নতুন ডকট্রিন প্রণয়ন সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পরিগণিত। প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্যে নতুন পোশাক ও ওয়েব ইকুইপমেন্ট, বিভিন্ন ভূষণ ও মেডেল এবং ইনসিগনিয়া প্রবর্তন, প্রযুক্তির প্রচলন, চিকিৎসা ও আবাসন অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক কাঠামো ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ৩৭ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট আর্টিলারি প্রতিষ্ঠাসহ একটি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন, আইসিটি ব্যাটালিয়ন এবং আর্মি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেনাবাহিনীর ইন্টেলিজেন্স কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্মি সিকিউরিটি ইউনিট এবং ডিজিএসএস'কে আর্মি ইন্টেলিজেন্স ব্রিগেড হিসেবে রূপান্তরের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সাঁজোয়া কোরের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত বেশ কিছু নতুন ট্যাংক, আর্মার্ড রিকভারি ভেহিক্যাল, আর্টিলারি কোরের জন্য এসপি গান এবং পদাতিক বাহিনীর জন্য আধুনিক ও যুগোপযোগী এপিসি এবং লোকেটিং ইউনিটের জন্য উইপ্যান্ লোকেটিং রাডার ও সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। আধুনিকায়নের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে সেনাবাহিনীর অর্ডন্যান্স ডিপোগুলোতে ওয়াশিং প্লান্ট এবং সিএসডিতে একটি অত্যাধুনিক অ্যামিউনিশন ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ইউএন মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণসহ সম্পূরক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে ইউএন কমপ্লেক্স, ইউএন লজিস্টিক্স সেড এবং বিএমএ মিউজিয়ামে একটি ইউএন কর্নার স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চিকিৎসা পরিমণ্ডলে সার্বিক সহায়তা বৃদ্ধিতে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের সাংগঠনিক কাঠামো বৃদ্ধি ও শয্যা সংখ্যা ১০০০ এ উন্নীতকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ও ১০০ শয্যাবিশিষ্ট সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সেনাসদস্যদের কল্যাণে মিলিটারি ফার্মসমূহের আধুনিকীকরণ এবং সিএসডি পোল্ট্রি ফার্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সার্বিক গতি আনা হয়েছে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ইউনিট ও সদর দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদবির মধ্যে সমতা আনা হয়েছে যাতে করে প্রশিক্ষিত জনবলকে সেনাবাহিনীতে ধরে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন র‍্যাংকে পদোন্নতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেডিক্যাল ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সামরিক চাকুরিতে আরোপনীয় বিষয়টির আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা সকল পদবির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও পরিবহন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য লালমনিরহাটে নতুন ডেইরী প্লান্ট স্থাপন ও ফ্রিজার ভ্যান চালু করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে শীঘ্রই অধিকসংখ্যক সেনাসদস্যকে দুগ্ধ প্রদান করা সম্ভব হবে। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য ঢাকা, সাভার এবং বগুড়া সেনানিবাসে সিএসডি 'এক্সক্লিউসিভ শপ' চালু করা হয়েছে এবং যশোর ও চট্টগ্রামে সিএসডি 'এক্সক্লিউসিভ শপ' চালু করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। সেনাসদস্যদের কর্মস্পৃহা ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেসিও/অন্যান্য পদবির সৈনিকবৃন্দের এলপিআর চার মাসের পরিবর্তে ছয় মাস, রেশন স্কেল উন্নীতকরণ, পারিবারিক অবসর ভাতা উন্নীতকরণ, সেনাপল্লী কার্যক্রম বেগবান ও ডিজিটাল বেতন পদ্ধতি প্রণয়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সেনাপরিবহন বাস প্রবর্তন এবং এ্যামিনিটি বোর্ড বিলুপ্তকরণ, মেডিকেল 'ইভাকুয়েশন সার্টি' বৃদ্ধি, ট্রাস্ট ব্যাংক হতে লোন গ্রহণের পলিসি সহজতরকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সামরিক সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর জন্য মূল্যবোধ ও চেতনাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সংহতি, আনুগত্য ও আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে যার সুফল সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য পাচ্ছেন।

ভূমিকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে' এই মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং দেশের যেকোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বা প্রয়োজনে জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনাবাহিনীর উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক। **জাতীয় পরিচয়পত্র ও মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট তৈরি।** জাতীয় পরিচয়পত্র তথা ভোটার আইডি কার্ড এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) তৈরির ব্যাপারে সরকারের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সেনাবাহিনী অত্যন্ত সফলভাবে পালন করেছে। 'In Aid to Civ Admin' এর আওতায় পরিচালিত এ প্রকল্পে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং জাতীয় পরিমণ্ডলে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

খ। **ঘুর্ণিঝড় আইলায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা।** পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলে আর্তমানবতার সেবায় বিশেষ করে ঘুর্ণিঝড় আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় জান-মাল রক্ষা এবং বিধ্বস্ত বাঁধ পুনর্নির্মাণের জন্যে সেনাবাহিনী যে আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তা দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

গ। **মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভারে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম।** মিরপুরের মাটিকাটা থেকে ঢাকা সেনানিবাসের উপর দিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সড়ক পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে। সরকারি অর্থায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশনের ১৬ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। বিমান বন্দর সড়কের বনানী রেল ক্রসিং এ যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নির্মিত হতে যাচ্ছে ওভারপাস। ওভারপাস ও ফ্লাইওভারকে সংযুক্ত করবে একটি লিংক ব্রিজ। একই প্রকল্পের আওতায় ফ্লাইওভার, ওভারপাস ও লিংক ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে।

ঘ। **পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালন ও উন্নয়ন।** অসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি সেনাবাহিনী পাবর্ত্য চট্টগ্রামে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সেখানকার উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই এলাকার উন্নয়নে সেনাবাহিনীর সদস্যগণ রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরি ও শিক্ষা বিস্তার করে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করছে।

ঙ। **বিশ্বকাপ ক্রিকেট।** ২০১১ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১ আয়োজনে বাংলাদেশের সাফল্য ক্রিকেট বিশ্বে

প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এ আয়োজনে গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর দায়িত্বসমূহের মধ্যে ছিল নিরাপত্তাজনিত সহায়তা, জরুরি চিকিৎসা, বাংলাদেশ পুলিশকে যানবাহন ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামাদি প্রদান, ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আলোক-সজ্জাকরণ এবং খেলা চলাকালে স্টেডিয়ামে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। এসব দায়িত্ব পালনে সেনাবাহিনীর নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

চ। **সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে নদী ভাঙ্গন রোধে সেনাবাহিনীর ভূমিকা।** গত ১৫ জুন ২০১১ হতে ১৯ পদাতিক ডিভিশন সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে শহর রক্ষা বাঁধের ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় নিয়োজিত ছিল। ১৮ জুলাই ২০১১ তারিখে শহর রক্ষা বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ১৯ জুলাই ২০১১ ভোরের মধ্যে সেনাসদস্য ও অসামরিক প্রশাসনের উদ্যোগে উক্ত এলাকার ভাঙ্গন বন্ধ করা হয়। গত ২১ জুলাই ২০১১ তারিখ রাতে পুনরায় শহর রক্ষা এলাকায় ভাঙ্গন ধরে। উক্ত ভাঙ্গন খুব তাড়াতাড়ি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এতে উক্ত এলাকার জনগণের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ায় ১০ আরই ব্যাটালিয়নের ৮০ সদস্যের একটি দল ঐ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে সারা রাত ব্লক ডাম্পিং এর মাধ্যমে ভাঙ্গনের গতি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

ছ। **আশ্রয়ণ প্রকল্পে সেনাবাহিনীর ভূমিকা।** আশ্রয়ণ প্রকল্প হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশনকে এ অঞ্চলের ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন জনগোষ্ঠীর আবাসনের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক অর্থ বছরগুলোতে ব্যারাক নির্মানের প্রকল্প দেয়া হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত সুনামের সাথে আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে ব্যারাক হাউজ নির্মাণ সম্পন্ন করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করে।

জ। **বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিরাপত্তা।** দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে বর্তমানে ভেড়ামারা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রদান, উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা তদারকি করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাসদস্যগণ দায়িত্ব পালন করছে।

ঝ। **ট্রেন দুর্ঘটনায় সেনাবাহিনীর উদ্ধার অভিযান।** গত ৮ ডিসেম্বর ২০১০ নরসিংদী রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকাগামী একটি ট্রেনের উপর চট্টগ্রামগামী অপর একটি ট্রেনের ইঞ্জিন উঠে গেলে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। সেনাসদস্যগণ ঘটনাস্থলের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অসামরিক প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সাথে উদ্ধারকার্যে অংশ নেয়। এছাড়াও সেনাসদস্যগণ নরসিংদী হতে ঢাকা পর্যন্ত রেললাইনটি ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে তোলার কাজে সহায়তা করে।

ঞ। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উদ্ধারকারী দল গঠন।** ভূমিকম্পসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সেনাবাহিনীতে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং, পদাতিক ও অন্যান্য কোরের কর্মদক্ষতা ও সম্পদ অনুযায়ী ভারি, মাঝারি ও হালকা- এই তিন শ্রেণিতে দল গঠন করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সশস্ত্রবাহিনী সরকারের নিকট হতে বেশ কিছু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সরঞ্জাম গ্রহণ করেছে।

ট। **বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনী।** ১৩ জানুয়ারি ২০১১ নারায়ণগঞ্জ জেলার পাগলায় ৫০ মেগাওয়াট রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট (বিডিপি) লিঃ, জার্মান প্রতিষ্ঠান এগ্রোটেক এজি এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্রাইমোডিয়াল এনার্জি লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে ডিপিএ পাওয়ার জেনারেশন ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এ প্লান্টটি স্থাপন করেছে।

ঠ। **শিক্ষা কার্যক্রম।** সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে আনয়নের লক্ষ্যে মিরপুর সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)। বিইউপি এর অবকাঠামোগত কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এছাড়া সামরিক বাহিনী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি (এমআইএসটি) এর অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহ শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সেই সাথে বেশ কয়েকটি নতুন ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। সেনাবাহিনী পরিচালিত ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ সকল ক্যাডেট কলেজে একটি কম্পিউটার ও ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধি শিশুদের

জন্য দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রয়াস স্কুল প্রতিষ্ঠা একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সেনাবাহিনী ঢাকার বেগুনবাড়ি খালসহ হাতির ঝিল এলাকায় সমন্বিত বিশাল বাঁধ, সড়ক ও রোকেয়া সরণি সংযোগ সড়ক নির্মাণে, বিমান বন্দর ও মিরপুর সেনানিবাস সংযোগ সড়ক, রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ইছামতি নদীর উপর রানির হাট সেতু নির্মাণ, কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়ন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে উজ্জীবিত করতে বিভিন্ন সেনানিবাসে স্মৃতি সরণি, স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাস রচনার কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে আজ পৃথিবীর অনেক দেশে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বিশ্ব সমাজে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। শান্তিরক্ষা মিশনে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে তারা বিশ্ববাসীর নিকট শুধু দেশের ভাবমূর্তিকেই উজ্জ্বল করেনি বরং জাতিসংঘের ভাবমূর্তিকেও উজ্জ্বলতর করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের বন্ধুপ্রতিম অনেক দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে জাপানের ভয়াবহ সুনামি ও ভূমিকম্পের পর আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা সে দেশে জরুরি সহায়তা প্রদানসহ শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, চীন ও হাইতিতে দক্ষতার সাথে দুর্যোগ মোকাবিলা করে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এহেন বিশ্বনন্দিত এবং নজরকাড়া কর্মকাণ্ডের জন্য দেশের মান বিশ্ববাসীর নিকট উজ্জ্বল হয়েছে।

উপসংহার

সঠিক দিকনির্দেশনা, নিরলস পরিশ্রম এবং সকল সেনাসদস্যের আনুগত্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিপক্ক পরিস্ফুটন আমাদের গৌরবময় সেনাবাহিনী। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনকল্পে এ বাহিনী দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশ সেবার পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত সেনাসদস্যগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ জাতির ঐক্য ও আস্থার প্রতীক, দেশের সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। দেশ মাতৃকার বিরুদ্ধে যে কোন অপচেষ্টা নস্যাৎ করে উত্তরোত্তর উন্নতি কল্পে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত। দীর্ঘ ৪০ বছর আগে সীমিত পরিসরে যাত্রা হয়েছিল যে সেনাবাহিনীর, সময়ের পরিক্রমায় তারা এখন যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ দক্ষ, অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও আদর্শ বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ফোর্সেস গোল-২০৩০ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে এ বাহিনী দেশের জন্য আরও শক্তিশালী প্রতিরক্ষাসহ জাতিগঠনমূলক কাজে প্রভূত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মেজর দিলীপ কুমার রায় *১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে শিক্ষা কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষক শ্রেণী 'সি' ও 'বি', ২২২ পদাতিক ব্রিগেড সদর দপ্তরে জিএসও-৩ (শিক্ষা) এবং মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি'তে প্রশিক্ষক শ্রেণী 'বি' হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তিনি সুদানে বাংলাদেশ সেক্টর হেডকোয়ার্টার্স এ সিভিল মিলিটারি কো-অর্ডিনেশন স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আর্মি জার্নাল, সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির প্রফেশনাল জার্নাল 'পদক্ষেপ' এ তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেনাসদর, জিএস শাখা, শিক্ষা পরিদপ্তরে জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-২ হিসেবে কর্মরত।*

বঙ্গোপসাগর ও আমাদের বাংলাদেশ

ক্যাপ্টেন এম মাহবুব-উল ইসলাম, (এন), পিএসসি, বিএন

ভূমিকা

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে অনন্য। নামকরণ থেকেই বুঝা যায় যে, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিকভাবে এ উপসাগর বঙ্গ নামের এ দেশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুগে যুগে বঙ্গোপসাগরের ব্যবহারের রূপান্তর ঘটেছে। এ উপসাগরের মাধ্যমেই বাণিজ্য, জ্ঞান ও মতাদর্শ বিস্তার এবং সামরিক শক্তির প্রয়োগ ঘটেছে, আবার এখানেই রয়েছে নানাবিধ মূল্যবান সম্পদ। বঙ্গের প্রাচীনকালের সভ্যতা, রাজনৈতিক প্রভাব, নৌ বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নয়নে এ সাগর রেখেছে অবদান। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন বঙ্গোপসাগরের উপর নির্ভরশীল। আর তাই দেশের উন্নয়নে এর সুষ্ঠু ব্যবহার অত্যন্ত অপরিহার্য।

ভৌগোলিক অবস্থান ও বিস্তৃতি

আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক ব্যুরোর সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব অংশে শ্রীলংকা ও ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূল হয়ে আন্দামান নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ শ্রীলংকার দুন্দ্রা হেড থেকে সুমাত্রার সর্ব উত্তর বিন্দু সংযোগকারী রেখার মাঝে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। বঙ্গোপসাগরের আয়তন ২.২ মিলিয়ন বর্গ কিমি, প্রস্থে প্রায় ১,৫০০ কিমি, গড় গভীরতা ২,৬০০ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা হচ্ছে ৫,২৫৮ মিটার।

নামকরণ

বিভিন্ন যুগে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। অর্থবেদ ও মহাভারতে বঙ্গোপসাগরকে 'পূর্ব সাগর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। টলেমি (৯০-১৬৮ খ্রিস্টাব্দ) এ সাগরকে 'গঙ্গা উপসাগর' নামে চিহ্নিত করেন। সপ্তম শতাব্দীর পর দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের হারিকেল রাজ্য উন্নতি ও নৌবাণিজ্যে পরিচিতি লাভ করলে এ উপসাগর 'বহর-এ-হরকন্দ' (হারিকেলের সমুদ্র) নামে পরিচিতি লাভ করে। দশম শতাব্দীতে চোলা সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে বঙ্গোপসাগর 'চোলা হ্রদ' এবং পরবর্তীতে বাঙ্গালীর নামানুসারে হিন্দিতে 'বাঙ্গাল কী খাড়ি' নামকরণ করা হয়। এক পর্যায়ে আরব নাবিকরা একে 'কালাহ' নামকরণ করে। ইউরোপীয়রা এ সাগরকে Gulf of Bengala/Bay of Bengal বা বঙ্গোপসাগর নামকরণ করে।

মানচিত্র নং ১-টলেমির চার্টের অংশ, বঙ্গোপসাগরকে 'গঙ্গা উপসাগর' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে (রামুকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে দেখানো হয়েছে)

বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি

ত্রিশ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে 'পানজিয়া' নামে একমাত্র মহাদেশ ও 'প্যান্থালাসা' নামে একমাত্র মহাসমুদ্র ছিল। বিশ কোটি বছর পরে মহাদেশটি ভেঙ্গে প্রথমতঃ দুটি অংশ হয়, যার এক অংশ 'গন্ডোয়ানা' যাতে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এন্টারটিকা, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া এবং অপর অংশ 'লউরেশিয়া' যাতে ইউরেশিয়া, গ্রিনল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকা ছিল। আর এদের মাঝে সৃষ্টি হয় টেথিস সাগর।

আট কোটি বছর আগে 'গন্ডোয়ানা' থেকে ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে বছরে ১০ সেন্টিমিটার করে

সরে পাঁচ কোটি বছর আগে ইউরেশিয়ার সাথে সংঘর্ষ ঘটে। ফলে পূর্ব টেথিস সাগর বিলুপ্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হয়। ইউরেশিয়ার সাথে ভারতের সংঘর্ষ, পূর্ব টেথিস সাগরের বিলুপ্তি এবং বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি বঙ্গোপসাগরের বিবর্তন যুগেযুগে বঙ্গোপসাগর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবয়বে উপনীত হয়েছে। ছয় কোটি বছর আগে রংপুরের উচ্চভূমি ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল এবং তখন বাংলাদেশে দুটি উপসাগর ছিল; সিলেট উপসাগর (লোহিত সাগর) ও বগুড়া উপসাগর (গঙ্গা সাগর)। এরপর বরেন্দ্র, মধুপুর ও লালমাই অঞ্চলের উদ্ভব ঘটে। চার কোটি বছর আগে আসাম অঞ্চলে ভূ আন্দোলনের ফলে তৎকালীন সমুদ্র আসাম এবং সিলেট অঞ্চল থেকে অনেক দক্ষিণে সরে আসে। আড়াই কোটি বছর আগে ভারত ভূখণ্ড বার্মা দ্বীপবলয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বঙ্গোপসাগর পূর্ণ অবয়ব লাভ করে। এ সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে দিক পরিবর্তন করে বিপুল পরিমাণ পলি দিয়ে কালক্রমে বঙ্গভূমি গঠন করে।

বঙ্গোপসাগরের বৈশিষ্ট্য

বঙ্গোপসাগর বিভিন্ন কারণে বৈশিষ্ট্যময়, নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো:

ক। বৃহত্তম সমুদ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম।

খ। বৃহত্তম উপসাগরীয় ব-দ্বীপ ও বৃহত্তম সামুদ্রিক উপদ্বীপ (Deep Sea Fan) নদী দিয়ে গঠিত।

গ। বৃহত্তম মহীসোপান।

ঘ। তাৎপর্যময় তলদেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতলস্পর্শী মহীখাদ ও নব্বই ডিগ্রি শৈলশিরা।

তলদেশের গঠন। পৃথিবীর কোন সমুদ্রে আর এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে নদীবাহিত তলানি দ্বারা সমুদ্র তলদেশ বঙ্গোপসাগরের মত এতটা প্রভাবিত হয়। বঙ্গোপসাগরের তলদেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সমভূমি রয়েছে। তবে কোন কোন স্থানে সমুদ্র সমভূমিতে পর্বতশ্রেণী, মালভূমি ও খাত রয়েছে যা আগ্নেয়গিরির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মহীসোপান গড়ে ২২০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত আয়তন ৭০,০০০ বর্গ কিমি, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মোহনায় মহীসোপান ১০০-২২৫ কিমি প্রশস্ত আর চট্টগ্রাম-টেকনাফ উপকূলে ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত এটি মাত্র ৫০-১৩০ কিমি। জোসেফ কারীর মতে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের নিচে ২২ কিমি পুরু তলানি স্তর রয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলে মহীঢালের চওড়া পশ্চিমাংশে ১০০ কিমি এর কম আবার কক্সবাজার উপকূলে প্রায় ২৫০ কিমি।

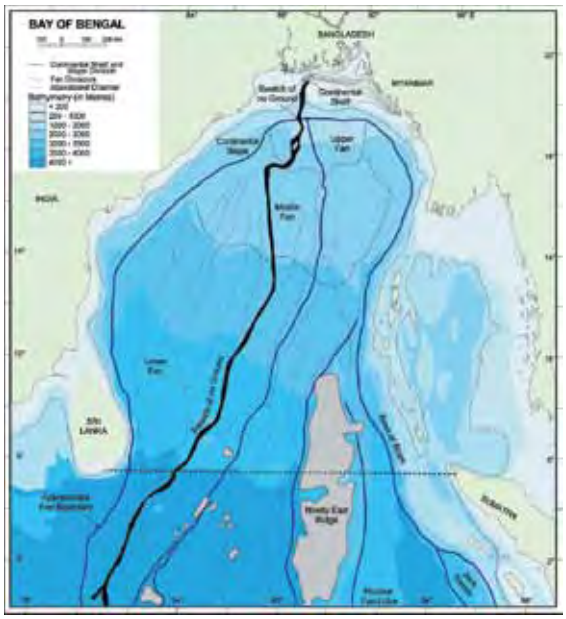

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের গঠন

অতলস্পর্শী মহীখাদ (Swatch of No Ground)

উপকূল থেকে ২৫ কিমি দূরে রয়েছে অতলস্পর্শী মহীখাদ। মহীখাদটি ১৫ কিমি প্রশস্ত, চারদিকে পানির গভীরতা ১৫/১৮ মিটার হলেও অতলস্পর্শীর গভীরতা প্রায় ১,২৮০ মিটার। এটি ভারত এবং শ্রীলংকার পূর্ব উপকূল ঘেঁষে প্রায় ৩,০০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ভারত মহাসাগরের ভূ-তাত্ত্বিক ফাটলগুলোর সাথে মিশেছে। নদীবাহিত পলির বেশিরভাগ এ খাদ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিস্তার লাভ করে, তাই এ উপকূলে ব-দ্বীপের বৃদ্ধি বা নতুন চরের সৃষ্টি তেমন লক্ষণীয় নয়। ভবিষ্যতে এখানে সাগরতলে ভূমিধসের ফলে নিকটস্থ উপকূল এমনকি হিরণ পয়েন্ট, আকরাম পয়েন্ট ইত্যাদি অঞ্চলও বিলীন হতে পারে।

অতলস্পর্শীর উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। প্রাচীনকালে যখন সমুদ্রের উচ্চতা কম ছিল তখন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত ধারা সজোরে প্রবাহের ফলে এর উৎপত্তি হয়েছিল বলে কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন বিচ্যুতির (fault) ফলে এর সৃষ্টি হয়েছে। অন্য মত হলো গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী বছরে যে চার বিলিয়ন ঘনমিটার পলি বহন করে তা অতলস্পর্শী এলাকা বাদে অন্যান্য এলাকায় জমা হয়েছে।

বেঙ্গল ফ্যান। অন্তঃসাগরীয় গিরিখাতের রূপান্তর ঘটে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফ্যান বেঙ্গল ফ্যানের উৎপত্তি হয়। ১৪ কোটি বছর আগে জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ৩.৮ কোটি বছর সময়ে নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে এর গঠন সম্পূর্ণ হয়। গত ১০ লক্ষ বছরে নদীবাহিত পলিমাটির সামান্য অংশ বেঙ্গল ফ্যানে প্রবেশ করেছে। এর দৈর্ঘ্য ৪,০০০ কিমি, প্রস্থ ১,০০০ কিমি এবং সর্ব্বোচ্চ তলানির গভীরতা হচ্ছে ১৬ কিমি যা বিশ্বে সবচেয়ে পুরু।

৯০° পূর্ব শৈলশিরা (90° East Ridge)

বঙ্গোপসাগরের গঠনের শুরু থেকেই থাকা তলদেশ খাড়া পর্বতমালা ৯০° পূর্ব শৈলশিরা মধ্যভারত মহাসাগরকে ৫,০০০ কিমি পর্যন্ত বিভক্ত করেছে।

বাংলাদেশের উপকূল। বাংলাদেশের উপকুলের দৈর্ঘ্য ৭৪০ কিমি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের আকৃতিতে (morpholog) বৈশিষ্ট্য অসংখ্য নদী জালের মতো প্রবাহিত হয়ে বছরে চার বিলিয়ন ঘনমিটার পলি বহন করে। নদীগুলোর মধ্যে বহুসংখ্যক চর ও দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। অপর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো শক্তিশালী জোয়ার ভাটা, বায়ুপ্রবাহ, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস ।

সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ। সেন্ট মার্টিন্স বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে ভূগর্ভস্থ চাপের ফলে মায়োসিন কালে (২.৩ কোটি ৫৩ লক্ষ বছর আগে) দ্বীপটির উত্থান ঘটেছে এবং এটি চট্টগ্রাম-আরাকান পাহাড়ের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। পরবর্তীতে এখানে প্রবাল জন্মেছে। সেন্ট মার্টিন্সের আয়তন ২১ বর্গ কিমি এবং দ্বীপটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, মধ্যভাগে কিছুটা সংকুচিত। দ্বীপটি পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত এবং এখানে প্রবাল, চুনা ও বেলে পাথর পাওয়া যায়।

বঙ্গোপসাগরের ভৌত বৈশিষ্ট্য

বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণ হচ্ছে এর ভৌগোলিক অবস্থান। মৌসুমি বায়ু শীতকালে উত্তর পূর্ব দিক থেকে এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে স্থলভাগে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। নদী প্রবাহিত বিপুল পরিমাণ পানির ফলে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা অপেক্ষাকৃত কম এবং প্রচুর পলিমাটির ফলে সাগরের পানি ঘোলাটে হয়। ঘোলাটে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারায় আলোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, ফলে পানির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্বকোণের জলের উচ্চতা বাড়ে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জলের উচ্চতা কমে এবং সেখানে গভীরতর অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি রাসায়নিক পদার্থ সমৃদ্ধ জলের উর্ধ্বগমন হয়। আর উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর ফলে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগরের জলের উচ্চতা কমে এবং জলের উর্ধগমন হয়। তাই দুবলার চরের কাছে এবং সোনাদিয়া দ্বীপের কাছে শীতকালে প্লাংকটন সমৃদ্ধ জলে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরের অন্যান্য অংশের জলে এত প্লাংকটন জন্মানোর জৈব রাসায়নিক কারণ না থাকায় সেসব জায়গায় মাছ কম পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে ২৪ ঘন্টায় দু'বার সর্বোচ্চ ও দু'বার সর্বনিম্ন জলস্তর পৌঁছে এবং জোয়ার ভাটার গড় উচ্চতা উপকূলে ৫.২ মিটার।

বঙ্গোপসাগর ব্যবহারের ইতিহাস ও বাংলাদেশ

সমুদ্রের ব্যবহার কালের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়েছে। তবে সমুদ্র মূলতঃ চারটি কারণে ব্যবহৃত হয়; চলাচল ও বাণিজ্যের মাধ্যম, জ্ঞান ও মতাদর্শ বিস্তার, সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে এবং সর্বোপরি সম্পদ আহরণ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহুকাল আগে থেকে বঙ্গোপসাগর প্রথম তিনটি কারণে ব্যবহৃত হয়ে আসলেও সাম্প্রতিক সময়ে চতুর্থ কারণ অর্থাৎ সম্পদ আহরণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলাচল

ধারণা করা হয় প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার বছর আগে যে মানবজাতি আফ্রিকা হতে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তারই একটি দল ত্রিশ হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগরের উপকূল হয়ে নৌযানে এ অঞ্চল, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে আরব, বঙ্গবাসী, দক্ষিণ ভারতীয়, বার্মা-তিব্বতীয় এবং সর্বশেষে ইউরোপীয়রা বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে এর উপকূলে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অন্যদিকে ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বে সমুদ্র পথে গমন করে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে বঙ্গবাসীর বিশেষ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার বর্ণনা দিয়েছেন ভেরলেরিয়াস ফ্লাকাস তার 'আরগণটিকা' ও ভার্জিল তার 'জর্জিকাস' গ্রন্থে।

চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তি হতে বাণিজ্য জাহাজে চড়ে শ্রীলংকা যান। তারপর থেকেই বহু চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক সমুদ্র পথেই শ্রীলংকা-বাংলাদেশ যাওয়া আসা করতেন। মধ্যযুগে চীনা বণিক ও পরিব্রাজকরা যেমন মা-হুয়ান (১৩৮০-১৪৬০), আরব বণিকেরা এবং পরে পর্তুগিজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম ও চেহাট-গাম বা

চট্টগ্রাম থেকে এ সমুদ্রোপকূল হয়েই আরাকান ও নিম্ন ব্রহ্মদেশে যাওয়া আসা করতেন। ইৎসিৎ সপ্তম শতকেই বলেছেন, হিউয়েন-তা নামে একজন চীনা পরিব্রাজক মালয় সমুদ্রকূলবর্তী কেদা হতে সোজা তাম্রলিপ্তি গিয়েছিলেন। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা চৌদ্দ শতকে সমুদ্রপথে বঙ্গ হতে যাতায়াত করেছেন।

বাণিজ্য

বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে বঙ্গের বাণিজ্য খুবই প্রাচীন। পান্ডু রাজার ঢিবিতে (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০) আবিষ্কৃত ক্রীট দেশের সীলমোহর এবং পেরিপ্লাস গ্রন্থ (Periplus of the Erythran Sea) থেকে জানা যায় সে সময়ে সমুদ্র পথে ক্রীট দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অন্যান্য দেশের সাথে বঙ্গের বাণিজ্য হত। জেমস টেলরের মতে খ্রীস্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর পূর্ব থেকে আরবরা জাহাজে করে বঙ্গদেশে আসতো এবং এ দেশ থেকে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে বস্ত্র রপ্তানি করত। মিসরে মমি মসলিনে আবৃত হতো এবং ৭৩ খ্রিস্টাব্দে পীনি (২৩-৭৯ খ্রিস্টাব্দ) মসলিনের প্রশংসা করেন। জেমস টেলরের মতে কর্পোস (তুলা) শব্দ থেকে কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি এবং এখানে মসলিন বস্ত্রাদি বয়ন করা হতো। স্মরণাতীত কাল থেকে মসলিন রপ্তানির কেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁও বিখ্যাত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ২২১ এ চীন ভারতের সাথে প্রথম বাণিজ্য সংযোগ স্থাপন করে এবং দক্ষিণ চীন থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত চীনাদের বাণিজ্য সম্পর্কে হাম রাজবংশের ইতিহাসে (৮০ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ আছে। পেরিপাস গ্রন্থ, প্লিনীর Naturalis Historia, টলেমির Geographia, পালি Niddesa এবং মিলিন্দবাই গ্রন্থ থেকে জানা যায় ৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য সুখ্যাতি লাভ করেছিল।

টলেমির বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, সে সময় পুরো গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকা বাণিজ্য করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। অথর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্রে মালয় থেকে টিন আমদানির কথা বলা হয়েছে। দারুচিনি ও ক্যাসিয়া চন্দন, পান, সুপারি ইত্যাদি পণ্য বিনিময় হতো রোমানদের সাথে। সুগন্ধি নার্ড গাছ এবং আসামের গণ্ডারের শাবক রোমে এবং চীনে রপ্তানি হতো। প্রাচীন বাংলার জাহাজগুলোতে ৫০০-৭০০ জন নাবিক থাকতো এবং ৭৫ টন পর্যন্ত মাল বহন করা হতো।

পাহাড়পুর এবং ময়নামতি বৌদ্ধ বিহারে বাগদাদের খলিফা রশিদের (৭৮৬-৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রা আবিষ্কার এ অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদের যাতায়াতের ইঙ্গিত দেয়। সিন্ধু অঞ্চলে আরবরা বসতি স্থাপন করার পর তাদের পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্য চীন পর্যন্ত এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর আরবদের অভ্যন্তরীণ হ্রদে পরিণত হয়।

একাদশ শতক থেকে শুরু করে মধ্যযুগে চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের নৌ যোগাযোগ চলতো। পাঁচ শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত সমতট ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ এলাকা। প্রাক মুসলিম যুগে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ একত্রে ছিল একটি অর্থনৈতিক ইউনিট যার অংশগুলো নদীপথে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত।

আর্মেনিয়রা দ্বাদশ শতকেই আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে চীন সাগরে পৌঁছেছিল। চৌদ্দ শতকের দিকে আরব-চীনা বণিকদের বাণিজ্য বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য পায়। তের-চৌদ্দ শতকে পূর্বদিকে ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলে সমুদ্র বাণিজ্য নতুন জীবন লাভ করে এবং চীনাদের প্রভাব কমে। মা হুয়ান জানান যে চট্টগ্রাম থেকে পূর্বদিক সুমাত্রা হয়ে চীন এবং পশ্চিম দিকে ভারত ও আফ্রিকার উপকূল বাংলাদেশের বাণিজ্যের অধীনে এসেছিল। সে সময়ে বাংলার ঐশ্বর্য এসেছিল অনেকটা তার বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে। ষোল শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের সূতীবস্ত্র দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার বাজারে স্থান পেয়েছিল এবং পশ্চিম দিকে এডেন ও হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তৃতি লাভ করেছে। টম পিরোসের বিবরণী (১৫১২-১৫১৫ খ্রিঃ) অনুসারে পার্সী, আরব, তুর্কী, পশ্চিম ভারতীয়, আর্মেনিয় এমনকি কনষ্টান্টিনোপোল থেকে আগত বণিকগণ বাংলাদেশে বসবাস করে মালাক্কা ও পাসাইয়ের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করত। সে সময়ে চট্টগ্রাম, রামু এবং দিয়াং দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমুদ্র বন্দর হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আগমনের পর অন্যান্য ইউরোপীয়রা এ অঞ্চলে নিজস্ব কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ষোলশত শতাব্দীতে পর্তুগিজরা চট্টগ্রাম (পোর্টো গ্রান্ড-বৃহৎ পোতাশ্রয়) এবং সাতগাঁও (পোর্টো পিকিউনো-ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়) এ বাণিজ্য কুটি স্থাপন করে। ষোল শতকের প্রথম মালাক্কা বন্দরে গুজরাটি মুসলমান

বণিকেরা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল এবং বাঙ্গালীরা মালাক্কা ও পূর্ব ইন্দোনেশিয়া থেকে মসলা আমদানি করত। সতের শতকের প্রথমে বাংলার শাসকরা সরাসরি বঙ্গোপসাগরের নৌ-বাণিজ্যে যোগ দেন। পরবর্তীতে রাজনীতির পরিবর্তনের ফলে মোগলরা নৌ বাণিজ্য থেকে সরে দাঁড়ায় আর সে স্থান ইংরেজরা পূরণ করে। আঠারো শতকে বাংলা থেকে ৫০-৬০টি পণ্যবাহী জাহাজ প্রতি বছর বিদেশ যেত। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অরাজকতা, ইংরেজদের কর আরোপে বৈষম্যতা ইত্যাদি কারণে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুক্ষিগত করার ফলে এ দেশীয়রা বাণিজ্যে প্রাধান্য হারায়।

দু'হাজার বছর আগে থেকে বাংলাদেশে উন্নত মানের কাঠের জাহাজ তৈরি হতো। পঞ্চদশ শতকে তুর্কীরা আলেকজান্দ্রিয়ায় জাহাজ না বানিয়ে চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে জাহাজ নির্মাণ করতো। কথিত আছে ট্রাফালগার যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী বাংলাদেশে তৈরি জাহাজ ব্যবহার করে। জার্মান নৌবাহিনীর একটি ফ্রিগেট ১৮১৮ সালে চট্টগ্রামে নির্মিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাষ্পচালিত ইস্পাতের জাহাজ নির্মাণের পর কাঠের তৈরি জাহাজের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞান ও মতাদর্শ বিস্তার

বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম এবং খ্রিস্টান এ চারটি ধর্ম অত্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধের আবির্ভাবের পর তাঁর শিষ্যেরা বুদ্ধের মহৎ বাণী ছড়িয়ে দিতে সমুদ্র পথে দেশ ভ্রমণে বের হন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের (৭৫০-১১৫৯ খ্রিঃ) শক্তিশালী নৌ ও বাণিজ্য বহরের ছত্রছায়াই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শত বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু ধর্ম সাগরপথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে সে অঞ্চলে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পর থেকেই আরব বণিকদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আওলিয়ার মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রসার লাভ করে। ষোল শতকে ইউরোপীয় বিশেষ করে পর্তুগিজদের আগমনের ফলে খ্রিস্টধর্ম এ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পর্তুগিজ যাজকরা শ্রীলংকা, ভারত, দক্ষিণ বঙ্গ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্থানীয়কে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করে।

সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম

খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৪ বঙ্গদেশের বিজয় সিংহ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে শ্রীলংকায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে বাংলার পাল সম্রাটরা মালায়, সুমাত্রা ও জাভাতে সাইলেন্দ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করে। টম পিরেসের 'সুমা ওরিয়েন্টাল' থেকে তথ্য পাওয়া যায় যে, উত্তর সুমাত্রার পাসাইয়ে প্রথম মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয় বাঙ্গালি মুসলমানদের দিয়ে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই চীনারা এ অঞ্চলে এক নৌশক্তি হিসাবে পরিচিত এবং এডমিরাল জেং হী এ অঞ্চলের রাজ্যগুলোকে নিজস্ব প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসার জন্য ১৪০৫-১৪৩০ সালে সাতবার ভারত মহাসাগরে অভিযান চালান। এ সময়ে তারা দু'বার বাংলার রাজদরবারে দূত পাঠায়।

ষোল শতক হতে ইউরোপীয়রা বাণিজ্যের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামে। পর্তুগিজরা ১৫০৫ সালে, ১৬০৫ সালে ওলন্দাজ, ১৬১১ সালে ইংরেজরা, ১৬২০ সালে দিনেমাররা এবং সর্বশেষে ১৬৬৯ সালে ফরাসিরা বঙ্গোপসাগরীয় উপকূলে বাণিজ্য আরম্ভ করে। কিন্তু পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিরঙ্কুশ বাণিজ্যিক অধিকার পেতে তারা সামরিক শক্তি বিশেষ করে নৌ শক্তি ব্যবহার করে এ অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলে। চট্টগ্রাম ষোল ও সতের শতকের অধিকাংশ সময় আরাকান রাজত্বের অন্তর্গত ছিল এবং সে সময়ে আরাকানের ক্ষমতা মধ্য বঙ্গোপসাগরে অপ্রতিরোধ্য ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আন্দামান ও নিকোবর দখল করে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। এ সময়ে মালাক্কা, আন্দামান এবং মায়ানমারের বন্দরগুলোতে জাপানিরা নৌ ঘাঁটি স্থাপন করে পুরো বঙ্গোপসাগর তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতীয় নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৭ম নৌবহর ১৫জন মার্কিন নাগরিককে উদ্ধারের নামে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করলে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটি সাবমেরিন প্রেরণ করে। তবে তাদের শক্তির মহড়া প্রদর্শনের আগেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

সামুদ্রিক সম্পদ

সমুদ্র থেকে খাদ্য হিসেবে বিভিন্ন রকমের মাছ, প্রাণী, ঝিনুক, শৈবাল, সংগ্রহ করা যায়। বঙ্গোপসাগরে

৪টি প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্র রয়েছে; সাউথ প্যাচেস, দক্ষিণ সাউথ প্যাচেস, মিডল গ্রাউন্ড এবং অতলস্পর্শী খাদ (মানচিত্র নং ৪)। বাংলাদেশের জলসীমায় ৪৭৫টি

মাছের প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে ৪২টি প্রজাতির বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে বাংলাদেশের প্রধান মৎস্য এলাকা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যের বার্ষিক উৎপাদন ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টন। বাংলাদেশ ২০১০-১১ অর্থবছরে ৪,৬০৪ কোটি টাকার সামুদ্রিক মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করেছে। দেশে মোট ১৯৪ টি ট্রলারসহ সর্বমোট ২১,০০০টি জলযান এবং পাঁচ লক্ষ জেলে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, সমুদ্র উপকূলে চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, সামুদ্রিক শেওলা ও আগাছা চাষ করা যেতে পারে।

বঙ্গোপসাগরে নদীবাহিত পলিতে ভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতি রয়েছে। হুগলি নদীর মোহনায় ওপেকস, ক্লোরাইড, গার্নেট, সিলিমেনাইট, জিরকোন, কোলোফেন ইত্যাদি, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পলিতে ইলাইট ও ক্লারাইট পাওয়া যায়। তাছাড়া সমুদ্র তলে পলিমাটির নিচে তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে (অতলস্পর্শী মহীখাদের পলিতে ২৬.৬০x১০$^{-৬}$ গ্রাম ইউরেনিয়াম প্রতি গ্রাম পলিতে পাওয়া যায়)। বাংলাদেশ সমুদ্র সৈকতের ১৭টি স্থানে বিশেষ করে কক্সবাজার, মহেশখালী এবং টেকনাফে মূল্যবান তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ জিরকন, রুটাইল, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট ও মোনাজাইট আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাগরের পানিতে দ্রবীভূত হিসেবে আছে বহু প্রকার অজৈব পদার্থ। প্রতি ঘন কিমি পানিতে প্রায় ৪ কোটি টন বিভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। যেমন প্রতি ঘন মাইল সমুদ্র জলে স্বর্ণ থাকে মাত্র সাড়ে সতের কেজি। সাগরজলে ৮০টি মৌল সনাক্ত করা গেছে। সাগরতলে বহু ধাতবীয় নুড়ি (nodules) থাকে যাতে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার পরিমাণ বেশি হয়। তাছাড়া তামা, সীসা, বেরিয়াম, মলিবডেনাম ইত্যাদি ধাতু পাওয়া যায়। আন্দামান ও নিকোবরে চূনাপাথরের সন্ধান মিলেছে।

পেট্রোলিয়াম মাটির তলায় শিলাস্তরে এক বিশেষ অবস্থায় থাকে। যেখানে পাললিক শিলার অবস্থান সেখানে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। ভারতের পূর্ব উপকূলে কাবেরী এবং কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল পাওয়া গেছে। তাছাড়া সুন্দরবনের দক্ষিণে সাগরে ভারত তেল না পেলেও গ্যাস পেয়েছে। মায়ানমারের আরাকান, ইয়াঙ্গুন ও মারতাবান উপকূলে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস ও তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশ উপকূল/সমুদ্রে জরিপ চালিয়ে তিনটি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় (কুতুবদিয়া, সাঙ্গু ও ভোলা। কিন্তু ৫,০০০ মিটার পর্যন্ত খনন করে কোন তেলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ফলে আশংকা করা যায়, যেহেতু বঙ্গোপসাগরে অল্পবয়সী পলির পরিমাণ বেশি তাই গ্যাস পাওয়া সম্ভাবনা বেশি আর তেলে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য এ বয়স ও পরিস্থিতি অনুকূলে নয়। তবে তেল পাওয়া যেতে পারে বেশ গভীরে অন্তত ৭-৮ কিমি গভীরে এবং স্থল ভাগের উত্তরাংশে।

সামুদ্রিক গবেষণা

সমুদ্রকে মানব কল্যাণে সুষ্ঠু ব্যবহার, সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ ও সংরক্ষণের জন্য সামুদ্রিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথম শতাব্দীতে লেখা পেরিপ্লাস গ্রন্থ হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। এরপর গ্রীক, রোমান এবং আরবরা সমুদ্র পথে যাতায়াত করে উপকূল, দ্বীপ, বায়ু, মৌসুমি বায়ু, সমুদ্রের দিক নির্দেশনা ইত্যাদির গ্রন্থ রচনা করেছিল। এডমিরাল জেং হী এর মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে চীনারা মানচিত্র তৈরি করে।

ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ডঃ উডম্যাসন প্রাণ ও উদ্ভিদকূল সম্বন্ধে প্রথমবারের মত গবেষণা করেন এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ভারতীয় মেরিন সার্ভে গঠিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানি সিওয়েল ভারতীয় সমুদ্র সমীক্ষা শুরু করেন। ইংল্যান্ডের 'চ্যাল্বোর'

১৮৭৩-১৮৭৬ সালে, জার্মানির 'গাজেল' ১৮৭৪-১৮৭৬, ১৮৮৫-১৯০২ সময়কালে ভারতীয় 'ইনভেস্টিগেটর', রুশ 'ভিতিজ' এ সি ও সাকরভ (১৮৮৭) বঙ্গোপসাগরে গবেষণার কাজ চালায়। ১৮৯৮-১৮৯৯ সালে জার্মানি 'ভালঙ্গিভিয়া' জাহাজে করে আবহাওয়া ও জীব বিজ্ঞানের উপর বঙ্গোপসাগরে গবেষণা চালায়।

১৯৫০-৫২ সনে ডেনমার্কের 'গ্যালাটেরা' এবং যুক্তরাজ্যের 'চ্যাল্লোর-২' গবেষণা পরিচালনা করে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের দিকে বঙ্গোপসাগরে বেশ কিছু গবেষণা চলেছিল। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান এবং ইন্টারন্যাশনাল ওসেনোগ্রাফিক কমিশনের যৌথ সহায়তায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

১৮৮১ সালে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফ তার বসানোর সময় থেকেই সর্বপ্রথম তলদেশের চার্ট তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে ব্রিটিশ, জার্মান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ অন্যান্য সংস্থা জরিপ করত চার্ট প্রকাশ করে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিগত কয়েক বছর আন্তর্জাতিক মানের চার্ট প্রকাশ করে বিপণন করছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১ সালে সামুদ্রিক জীববিদ্যা বিভাগ খোলা হয় এবং ১৯৮১ সালে বিভাগটি সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে রূপলাভ করে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ১৯৮০ সালে একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমুদ্র গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্যা এক্সপ্লোরেশন এন্ড এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্যা রিসোর্স অফ দ্যা সীজ এন্ড ওশেন কর্তৃক এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ সেমিনারের পর প্রথম অভিযান চলে ১৯৮০ সালের ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।

উল্লিখিত সেমিনার ছাড়াও নৌবাহিনী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়ামি ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। বঙ্গোপসাগরের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও উপাত্তের পরিমাণ খুব বেশি নেই। তবে বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে মৎস্য সম্পদ, বিদেশি তৈল সংস্থা, বিদেশি সংস্থা এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী চার্ট প্রণয়নে এবং বিশেষ করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে জরিপ কার্য সম্পাদন করেছে।

বঙ্গোপসাগরে আন্তরাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা নির্ধারণ

বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় দেশগুলো তাদের মধ্যকার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করেছে। গত ১৪ মার্চ ২০১২ এক ঐতিহাসিক রায়ে সমুদ্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশ-মায়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করেছে। আদালতে বাংলাদেশের অন্যান্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল সমতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ, সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপের ১২ মাইল টেরিটোরিয়াল সাগর এবং বাংলাদেশের মহীসোপান প্রাপ্তি

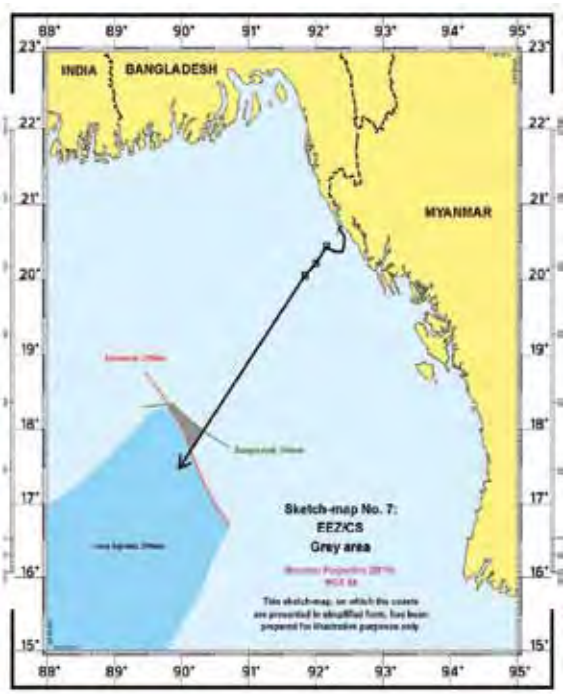

নিশ্চিতকরণ। আদালত বাংলাদেশের দাবির সাপেক্ষে উত্থাপনকৃত তথ্যাদি বিবেচনা করে এ ঐতিহাসিক রায় দেয়, যার ফলে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ১,১১,৬৩১ বর্গ কিমি আয়তনের সমুদ্র এলাকা। তাছাড়া রায়ে মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত হলো। উপরন্তু এ রায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণ রায়ে প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। আদালতের রায়ে সমতার ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ এবং মহীসোপান প্রাপ্তি নিশ্চিত।

বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলে বঙ্গোপসাগরে প্রতিবছর এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নভেম্বর সময়কালে গড়ে ৪.৭ টি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় যা উপকূলে আঘাত হানে। অনেক ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সামুদ্রিক

জলোচ্ছ্বাস বিপুল প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করে। মৌসুমি বায়ুর ফলে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের পূর্বে ইন্দো-অস্ট্রেলিয় প্লেট, ভারতীয় প্লেট এবং বার্মা মাইক্রোপ্লেটের সংযোগস্থলে ভূমিকম্পের প্রকোপ রয়েছে। ভূমিকম্পের সাথে সাথে বঙ্গোপসাগরে সুনামিও হতে পারে। গ্রিন হাউস প্রক্রিয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকা বিশেষ করে বাংলাদেশের নিচু এলাকা জলমগ্ন হবে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করেন যে, এ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের দশ শতাংশ এলাকা ডুবে যাবে এবং এতে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ জনগণ স্থানচ্যুত হবে।

বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব

ভারত ও মায়ানমার বাংলাদেশকে তিন পাশ ঘিরে রেখেছে এবং বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও বাণিজ্য বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্য, জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামাল, সামরিক সরঞ্জামাদি এবং উৎপাদিত পণ্য সমুদ্রপথেই আমদানি-রপ্তানি করা হয়। স্থলভাগের সীমাবদ্ধতার ফলে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও জ্বালানির চাহিদা বঙ্গোপসাগর হতে মেটানো সম্ভব। এ সাগরের উপকূলে বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। দুটি উদীয়মান শক্তি চীন ও ভারতের সাথে তাল মিলিয়ে আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং বন্দর সুবিধা ব্যবহার করে বাংলাদেশ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে।

ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব

বঙ্গোপসাগরের অবস্থান ভূ-কৌশলগত ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব কোণে এবং সম্প্রতিকালে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত মহাসাগর সম্পর্কে আমেরিকার বিখ্যাত এডমিরাল মাহান (১৮৪০-১৯১৪) উনবিংশ শতাব্দীতে বলেছিলেন "Whoever controls the Indian Ocean, dominates Asia, this ocean is the key to the seven seas. In the 21st century, the destiny of the world will be decided on its waters।" বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে চলে গেছে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথ যা বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ জ্বালানি মধ্যপ্রাচ্য হতে উত্তর-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে চীন ও জাপানে সরবরাহ করে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মায়ানমার বিপুল পরিমাণে জ্বালানি তেল ও গ্যাস আবিষ্কার করেছে এবং বিপুল পরিমাণ মজুতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রার নৌশক্তি গঠন করে বঙ্গোপসাগরসহ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে তার সামারিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে অপর উদীয়মান শক্তি চীন তার প্রভাব বিস্তার, জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং নতুন বাজার সৃষ্টির জন্য অতিদ্রুত নৌশক্তি বৃদ্ধি করে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের পর অদূর ভবিষ্যতে ভারত মহাসাগর তথা বঙ্গোপসাগরে উপস্থিতি বৃদ্ধি করবে। যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় চীনের এ আধিপত্য ও উপস্থিতি কোন ক্রমেই মেনে নেবে না, আর সে জন্য তার নৌ জাহাজের ৬০ শতাংশ এ অঞ্চলে মোতায়েন করবে বলে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে।

দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর বর্তমানে মায়ানমার বর্হিবিশ্বের সাথে তার যোগাযোগ আরম্ভ করেছে। ফলে এশিয়ার সবচেয়ে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ভূ-কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ দেশের সাথে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য বর্তমানে পশ্চিমা দেশগুলো আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পূর্বে শুধুমাত্র চীন ও ভারত মায়ানমারের সাথে বাণিজ্যিক ও কৌশলগত সর্ম্পক বজায় রেখেছিল, আর পশ্চিমা দেশগুলো বর্জন করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে জ্বালানির উৎসের দখল এবং চীনের প্রভাব বলয় হতে মুক্ত করতে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতিকালে মায়ানমারের সাথে সর্ম্পক উন্নয়নে অতি তৎপর হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তিন নৌশক্তি; যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীনের প্রতিযোগিতার ফলে এ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশসহ বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অন্যান্য দেশ নিজস্ব নৌবাণিজ্য অব্যাহত রাখা এবং সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও রক্ষার জন্য নিজ সমুদ্র এলাকায় পাহারা, বহিঃশত্রু ও জলদস্যু আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সীমিত আকারের নৌবাহিনী গড়ে তুলেছে।

উপসংহার

যুগে যুগে বঙ্গোপসাগরের ব্যবহারের রূপান্তর ঘটেছে। বর্তমানে এ সাগরে নৌবাণিজ্য আর সম্পদ আহরণের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সাগরকে জনগণের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য গবেষণা, সম্পদের অনুসন্ধান, আহরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজন। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চালু রাখা, সামুদ্রিক সম্পদের আহরণ, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান এবং অবাধ নৌ বাণিজ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তবে সমুদ্রে পরস্পরের সাথে সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করতে হবে। এ অঞ্চলের সম্ভাব্য বৃহৎ নৌশক্তির উপস্থিতির ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বাংলাদেশকে ভারসাম্যপূর্ণ কুটনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। Alam, Rear Admiral Mohammad Khurshed, ndc, psc, BN (retd), Bangladesh's Maritime Challenges in the 21st Century, Pathak Shamabesh, Dhaka, 2004.

২। The Periplus of the Erythrean Sea-Travel and Trade in the Indian Ocean by a Merchant of the First Century, Longmans, Green and Co, NY, US, 1912.

৩। মৃধা, ড. শহিদুল্লাহ, বঙ্গোপসাগর : সমুদ্র বিজ্ঞান (প্রথম খন্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৫।

৪। মৃধা, ড. শহিদুল্লাহ, বঙ্গোপসাগর : জীব সমুদ্র-বিজ্ঞান ও সমুদ্র সম্পদ (দ্বিতীয় খন্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৯৫।

৫। Roy, Atul Chandra, A History of Mughal Navy and Naval Warfares, The World Press Private Ltd, Calcutta, 1972.

৬। হক, সৈয়দ আহমাদুল, চট্টগ্রামের শিল্প ও বাণিজ্য, নজরুল ইসলাম চৌধুরী ও সৈয়দ আহমাদুল হক, চট্টগ্রাম, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

৭। List of Cases No. 16, Judgement on Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, International Tribunal for the Law of the Sea, 14 March 2012, http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_16/1-C16_Judgment _14_02_2012.pdf, accessed on 15 March 2012.

৮। http://www.emcs.or.jp/guidebook/eng/pdf/17bengal.pdf accessed on 25 Nov 2011.

ক্যাপ্টেন মাহবুব-উল ইসলাম, (এন), পিএসসি, বিএন *১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি ব্রিটানিয়া রয়েল নেভাল কলেজ এবং স্কুল অফ মেরিটাইম অপারেশন্স, যুক্তরাজ্য থেকে যথাক্রমে ইন্টারন্যাশনাল মিডশিপম্যান কোর্স ও ইন্টারন্যাশনাল সাব লেফটেন্যান্টস কোর্স সম্পন্ন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি নৌবাহিনীর বিভিন্ন পেট্রোল ক্রাফট, ফ্রিগেট ও ঘাঁটিতে বিভিন্ন পদে এবং নৌ সদর দপ্তরে স্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতে নেভিগেশন স্পেশালাইজেশন কোর্স এবং মিরপুর স্টাফ কলেজ থেকে ও নেভাল ওয়ার কলেজ যুক্তরাষ্ট্র হতে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি উত্তর ইরাকে জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালন করেন। দুটি ফ্রিগেটের অধিনায়কত্বের পর বর্তমানে তিনি নৌসদরে পরিচালক, নৌ পরিকল্পনা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।*

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগ : একটি স্মৃতিময় অভিজ্ঞতা

স্কোয়াড্রন লিডার মোঃ শাহজালাল, জিডি (পি)

ভূমিকা

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা এক গৌরবজনক অধ্যায়। ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধে পর্যবেক্ষক প্রেরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল যার অগ্রযাত্রা। আজ সেই বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আজ সারা বিশ্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আন্তরিকভাবে সমাদৃত। এর পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের পেশাদারিত্ব, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা, নৈপূণ্য, দায়িত্ববোধ এবং মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা; আর অন্যদিকে রয়েছে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ। শান্তিরক্ষার মহান কর্তব্য পালনে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর ৯৬ জন শান্তিরক্ষী জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সেনাবাহিনীর ৯১ জন, বিমান বাহিনীর ৪ জন এবং নৌবাহিনীর ১ জন সদস্য। তাঁদেরই কিছু সদস্যের হৃদয়বিদারক আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে আজকের এই লেখনী।

গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গোয় শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এবং সম্পদে ভরপুর মধ্য আফ্রিকার একটি দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো। কিন্তু পারস্পরিক অন্তঃকলহ, হানাহানি ও বহিঃশক্তির প্রভাবে দেশটির সহজ সরল সাধারণ জনগণের মধ্যে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। ভেঙ্গে পড়ে শাসন ব্যবস্থা, স্থবির হয়ে পড়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম। নিজ দেশেই হয়ে পড়ে তারা নিঃস্ব ও উদ্বাস্তু। জনগণের নিরাপত্তা ও সীমাহীন দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য ১৯৬০ সাল থেকেই এ দেশটিতে চলে আসছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম। এ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) এ ২০১২ সালে যোগ দেয় বাংলাদেশ সেনাবহিনী। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিট ব্যানব্যাট নামে পরিচিত। আর ২০০৩ সালে অন্তর্ভুক্ত হয় ৫টি হেলিকপ্টারসহ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি ইউটিলিটি এভিয়েশন ইউনিট এবং একটি এয়ার ফিল্ড সার্ভিসেস ইউনিট, সম্মিলিতভাবে যা ব্যানএয়ার কন্টিনজেন্ট নামে পরিচিত। ব্যানএয়ারের অবস্থান ছিল দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চল বুনিয়া এলাকায়, যা ৬ নম্বর সেক্টর নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ইতুরি বিগ্রেড। শুরু থেকেই ব্যানএয়ারের কন্টিনজেন্ট দুটি অত্যন্ত পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিভিন্ন দেশের মোতায়েনকৃত শান্তিরক্ষীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা যেমন; সেনা চলাচল, রসদ সরবরাহ, অভিযান পরিচালনায় সার্বক্ষণিক সহায়তা (সৈন্য গমন/প্রত্যাগমন) উদ্ধার ও অনুসন্ধান, হতাহতদের স্থানান্তর, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, যাত্রী ও মালামাল চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মানবিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করার কারণে ব্যানএয়ার হয়ে উঠে সকলের মধ্যমণি এবং কঙ্গোয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের এক অপরিহার্য অংশ। ব্যানএয়ারের কার্যক্রম শুধু বুনিয়া এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জাতিসংঘের অনুরোধে নিজ দায়িত্বাধীন এলাকার বাইরেও অন্যান্য সেক্টরের অধীনে সুদূর গোমা, কিসাংগানি, জেমিনা ইত্যাদি এলাকাতেও বিভিন্ন ধরনের দুঃসাহসিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। সাফল্য ও স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ২০১০ সালে বিমান বাহিনীর সুপরিসর সি-১৩০ পরিবহন বিমান কঙ্গোয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

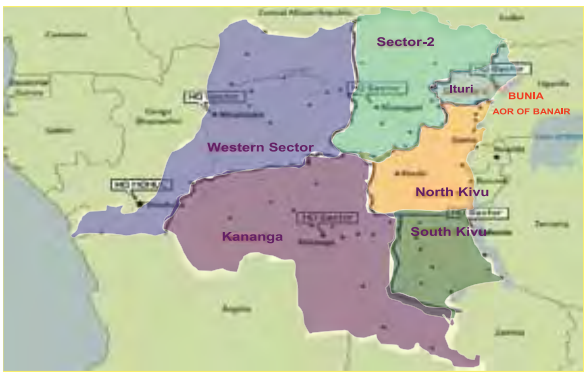

ব্যানএয়ারের অবস্থান

ব্যানএয়ারে আমার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

২০০৪ সালে বাংলাদেশ ইউটিলিটি এভিয়েশন ইউনিট-২ এর একজন সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ আসে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে ২০০৪ সালের ১১ আগস্ট

ভোর পাঁচটায় যাত্রা শুরু করলাম কঙ্গোর উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ ৭ হাজার কি.মি. পথ যাত্রা শেষে পৌঁছলাম উগান্ডার এনতেবে (Entebbe) বিমান বন্দরের জাতিসংঘ ট্রানজিট ক্যাম্পে। এরপর থেকে জাতিসংঘ বিমান যোগে কঙ্গোর বুনিয়া শহরের ব্যানএয়ার ক্যাম্পে আগমন হয় আমার। পর্যায়ক্রমে এখানকার করণীয় সম্পর্কে চলতে থাকল বিভিন্ন ধরনের ব্রিফিং। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। দেখলাম ক্যাম্পের উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যাচ্ছে ট্রেসার রাউন্ড। প্রত্যুত্তরে বুনিয়া এয়ার ফিল্ডের নিরাপত্তায় নিয়োজিত শান্তিরক্ষীরাও গোলাগুলির শব্দে প্রকম্পিত করে তুলল গোটা এলাকা। আমার জন্য এ ছিল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। রোমাঞ্চিত হলেও অবাক হইনি। প্রাথমিকভাবে এখানকার সার্বিক অবস্থার ভয়াবহতা অনুধাবন করে শান্তিরক্ষার মহান প্রয়াসে আন্তরিকভাবে অর্পিত কর্তব্য সম্পাদনে সচেষ্ট হই।

বেদনার স্মৃতিময় একটি দিন

সবকিছু যখন স্বাভাবিক গতিতে চলছিল ঠিক তখনই ২০০৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল আনুমানিক দশটায় খবর এল ব্যানব্যাটের একটি দল মিলিশিয়াদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। জরুরি সাহায্যের প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান, হতাহতের সংখ্যা অথবা কি ধরনের সহায়তার প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য ছিল না। তা সত্ত্বেও MONUC মিশন সদর দপ্তর কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়ার পর ব্যানব্যাটের একটি উদ্ধারকারী কমান্ডোদলসহ ব্যানএয়ারের দুটি এম আই-১৭ হেলিকপ্টার খুব দ্রুত উড্ডয়ন করে। একটি হেলিকপ্টারের পাইলট হিসেবে ছিলেন উইং কমান্ডার মাহমুদুন্নবী ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লিডার) ইসতিয়াক এবং অপর হেলিকপ্টারে ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (বর্তমানে স্কোয়াড্রন লিডার) সৈয়দ রকিবুল হাসান ও আমি।

ক্যাফে (Kafwe) ক্যাম্পের অবস্থান

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এ ঘটনার কিছুদিন আগে বুনিয়া থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. পূর্বে ক্যাফে (Kafwe) নামক স্থানে স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যানব্যাটের একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এলাকাটি ছিল খুবই দুর্গম এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তিনদিক সুউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা এবং অপরদিকে সুবিশাল হ্রদ এলবার্ট। একমাত্র হেলিকপ্টারের মাধ্যমেই ক্যাম্পটিতে প্রয়োজনীয় রসদ, পানি এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছানো হত।

ঘটনার দিনে ব্যানএয়ারের হেলিকপ্টার নিয়ে জাতিসংঘের দুটি এমআই-৩৫ এ্যাটাক হেলিকপ্টারের ছত্রছায়ায় প্রথমে ক্যাফে ক্যাম্পের দিকে যাই। নিকটবর্তী হয়ে আমরা প্রথমেই ক্যাম্পে অবস্থানরত ব্যানব্যাট সদস্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। তাদের মাধ্যমে জানা গেল ক্যাপ্টেন শহীদ আশরাফের নেতৃত্বে ব্যানব্যাটের ২০ জন সদস্যদের একটি দল পার্শ্ববর্তী এলাকায় নিয়মিত টহলে যায়। সর্বশেষ যোগাযোগ অনুযায়ী দলটি আক্রান্ত হবার সংবাদ দেয় এবং বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ তারা সম্পূর্ণরূপে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এই তথ্যানুযায়ী আমরা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় অনুসন্ধান চালাতে থাকি। কিছুক্ষণ অনুসন্ধান তৎপরতার পর ক্যাম্প থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম আকাশে একটি সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হয়। ধোয়ার উৎস অনুসন্ধান করে ব্যানএয়ারের প্রথম হেলিকপ্টারটি নিকটবর্তী এলাকায় গমন করে এবং কয়েকজন ব্যানব্যাট সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত হবার পরে উক্ত স্থানে অবতরণ করে। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, ক্যাপ্টেন শহীদসহ দলটির একটি অংশ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই তথ্যমতে হেলিকপ্টারগুলো থেকে আমরা আরো অধিক এলাকাজুড়ে ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু করি। এক পর্যায়ে একটি হেলিকপ্টার হতে ভূমিতে দুজন মানুষের দেহ শায়িত অবস্থায় শনাক্ত করা হয়। অনেক সতর্কতাসহ ব্যানএয়ারের প্রথম হেলিকপ্টারটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৬২০০ ফুট সুউচ্চ দুর্গম পাহাড়ের শীর্ষে অবতরণ করে এবং তিনজন ব্যানব্যাট সদস্যের লাশ শনাক্ত ও উদ্ধার করে। অপর হেলিকপ্টারটি নিয়ে আমরা প্রথম হেলিকপ্টারকে অনুসরণ করে নিকটবর্তী এলাকায় গমন করি এবং পাহাড়ের চূড়ায় এবং ঢালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশগুলোর অবস্থান নির্ণয় করে উক্ত এলাকায় অবতরণ করি ও ছয়জনের মৃতদেহ উদ্ধার করি।

মিলিশিয়া অধ্যুষিত খুবই দুর্গম এই এলাকায় কাজটি ছিল যেমন দুঃসাধ্য তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু

শান্তিরক্ষার মহান কর্তব্য ও প্রবল দেশপ্রেম আমাদের এ অসাধ্য সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। হেলিকপ্টারগুলো থেকে কমান্ডোদের ঘটনাস্থলে মোতায়ন করার সময় এবং মৃতদেহগুলো উদ্ধার করার পর্যায়ে এমআই-৩৫ এ্যাটাক হেলিকপ্টার দ্বারা পাশ্ববর্তী মিলিশিয়া অবস্থানের উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন এলাকাটির দুর্গমতা এমন ছিল যে, পরবর্তীতে তদন্তদলসহ জাতিসংঘের একটি হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে অবতরণ করতে ব্যর্থ হয়।

মৃতদেহগুলো উদ্ধার করার পরে আমরা বুনিয়ায় অবস্থিত ঘাঁটির উদ্দ্যেশে যাত্রা শুরু করি। বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রাথমিকভাবে সকলে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মুহূর্তেই এ হৃদয়বিদারক সংবাদটি গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে। শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে গোটা বাঙালি জাতি। এ ঘটনার নিন্দা ও সমবেদনা জানায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।

এ ঘটনার ফলে নির্দেশ আসে আরো অধিকসংখ্যক সৈন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন করার। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ঝুঁকিপূর্ণ দুর্গম এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ব্যানএয়ারের হেলিকপ্টারগুলো প্রায় কয়েক শতাধিক শান্তিরক্ষী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করে। পরবর্তীতে দুর্বৃত্তদের দমনে আরও অনেক অভিযান পরিচালনা করা হয় যার সবগুলোতেই ব্যানএয়ারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কঙ্গোর বর্তমান অবস্থা

এরই মধ্যে ২০১০ সালে দ্বিতীয়বারের মতো আবার আমার সুযোগ হয় কঙ্গোর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার। কিন্তু এবারের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ যেন অন্যরকম এক কঙ্গো। আগের মতো নেই যুদ্ধাবস্থা, নেই কোন ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। দূর হয়েছে জনগণের চোখ-মুখের আতঙ্কের ছাপ। জনসাধারণ ফিরে এসেছে স্বাভাবিক কার্যক্রমে। চলছে স্কুল, কলেজ আর অফিস-আদালত। প্রসার ঘটেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের, উন্নতি ঘটেছে যোগাযোগ ব্যবস্থার। আগে যেমন কোথাও বের হলে নিতে হত পূর্ণ সামরিক সজ্জা, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের অন্যান্য শহরের মতোই চলাচলে এখানে এসেছে স্বাভাবিকতা ও প্রাণচাঞ্চল্য। জাতিসংঘ বাহিনীর কার্যক্রমেও এসেছে পরিবর্তন। নেই আগের মত শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম, আছে স্বাভাবিক কার্যক্রমে সহায়তা করার অঙ্গীকার। এ যেন অবাক বিস্ময়ে দেখছি এদেশের প্রকৃতির সাথে মানানসই অন্যরকম এক কঙ্গো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের কার্যক্রম সীমিত ছিল (MONUSCO-United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo) এ নিয়োজিত শান্তিরক্ষী সেনাদের এবং অন্যান্য মানবিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

উপসংহার

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর এ ধরনের অনেক আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে দেশটিতে শান্তি ফিরিয়ে আনার। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার। এ অধ্যায়ে এসে এখন মনে হচ্ছে এ দৃশ্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর শত প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগেরই ফসল। শান্তি প্রতিষ্ঠায় যারা অকাতরে বিলিয়ে গেলেন প্রাণ তাঁদের ত্যাগ যেন যথার্থরূপে পূর্ণতা পেয়েছে। হয়েছে শতভাগ সফল। কঙ্গোর জনগণের স্মৃতিতে চিরকাল তাঁরা হয়ে থাকবেন অম্লান এক শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী বিজয়ী বীররূপে। তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি ।

স্কোয়াড্রন লিডার মোঃ শাহজালাল ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে বিমান বাহিনীতে জিডি(পি) শাখায় কমিশন লাভ করেন। তিনি স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এস এস এফ) এর উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৪-২০০৫ এবং ২০১০-২০১১ সালে তিনি পাইলট হিসেবে ব্যানএয়ার কন্টিনজেন্টের সাথে ডি আর কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন MONUC ও MONUSCO -তে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১নং স্কোয়াড্রনে পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

HISTORIC MARCH 1971 AND INITIAL RESISTANCE AGAINST OCCUPATION FORCES

Brigadier General Md Sarwar Hossain, hdmc, psc

Introduction

Around 1970, the Bengalee resentment against Pakistani military and the capitalist elite rose to the peak, which was clearly reflected in the result of December 1970's General Election. The rhetoric of Bengalee nationalism not only threatened the military dictators but the whole edifice of the capitalist state and the political players in the West. Supposedly, the people in the East expected a swift transfer of power, instead of which the Pakistan authority had utilized the electoral process as a measure to contain the nationalist fervour of the Bengalee people. The post election parleys couldn't even deliver an acceptable solution. Anticipating the signs of Bengalee conviction to ascend to power, they resorted to military action.

The "Operation Searchlight" began on the night of March 25, 1971 when the Pakistani military command pushed its forces across the traditional military inhibitions to go for mass murders, rapes and plundering that silenced the lifestyle of the major cities across the country. The concept of Operation Searchlight was inspired by the My Lai massacre that U.S. Army carried out in Vietnam. The Pakistani regiments engaged in the genocide in the same manner as practised under General Gracey in Vietnam. Known as "Butcher of Beluchistan", General Tikka Khan also joined the team replacing the Governor of East Pakistan Vice Admiral Syed Mohammad Ahsan who used to be regarded for his compassion.

No army - how mighty be it may — can ever defeat a people who have decided to fightback. As such, Pakistani estimate of one month time for accomplishing the mission turned into a ceaseless struggle for long nine months. The Bengalee people resisted all over under the leadership of handful of military officers who managed to escape from their units to join the war. The war started unfolding in its dimension and kind at unprecedented cost in lives and blood. The initial resistance phase had been the costliest one though, but it gave us resilience and resolve to take the fight to an eventual victory. 1971 war is a huge canvass with an assorted dimensions. This paper will therefore include the important events of March 1971 leading to the outbreak of war and the initial resistance offered by the freedom fighters of central region.

Post Election Parleys

Post-election reaction saw mixed opinion from the Pakistani political and military hieracrchy. Initial reaction of General Yahya was as it should have been. "As far as I am concerned my job is finished", said the President immediately after the election result had been announced. Constitutionally, Sheikh Mujibur Rahman was to take over as Prime Minister of undivided Pakistan. Many in the military hierarchy including the Director General of the powerful Inter-service Intelligence could not accept the election result. Bhutto assumed political control in the West and was not ready to sit in the opposition. " No constitution could be made," said the civilian dictator and feudal landlord "without Pakistan Peoples Party's cooperation."

No Light in Sight

The time had now arrived for parleys to begin between the President Yahya Khan, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Julfiquer Ali Bhutto. First such meeting took place at the President's House at Dhaka on 13 January 1971. In this meeting Awami League was represented by Sheikh Mujibur Rahman, Tajuddin Ahmed, Khondkar Mushtaq Ahmed, Qamar-uz-Zaman and two others while the President was accompanied by Vice Admiral S.M Ahsan, Lieutenant General Sahibzada Yaqub Khan and Lieutenant General S.G.M.M. Peerzada. During the session, the President expressed his desire without naming to include some West Pakistani members in his cabinet to give it a national character, which was assured by Mujib. As none of the parties achieved majority in both wings, the Peoples Party capitalized on that to bargain for power sharing.

Disillusioned, General Yahya accepted Bhutto's invitation. So, on his return from Dhaka, Yahya with some of his advisers visited Larkana as Bhutto's guest. "Please tell Mujib that the West Pakistani leadership is in my (Bhutto's) hand and it will be good for the country if he, for the sake of the nation, took Bhutto in the Government and that if he does not do so we (army) will use military force" proposed Bhutto in his meeting with the President. History had seen the later events and in that how precisely his wishes were materialized. Later, on January 27, when Bhutto went to Dhaka and met Mujib, they had some disagreements which could have been resolved had Bhutto been offered the post of vice president or the foreign minister. But, it was hard for Mujib to make such a concession. Mujib was not ready to accommodate Yahya either, who was aspiring to stay on as the President.

Bhutto's Arrogance

On 13 February 1971, General Yahya announced his decision to call the National Assembly session on 03 March 1971. Bhutto refused to attend the National Assembly session which was condemned by all. On 13 February 1971, Bhutto having met the President declared that if the National Assembly were held on 03 March he would launch a popular movement. Bhutto even threatened members elected to the constituent assembly from West Pakistan that he would break their legs if they attended its inaugural session in Dhaka, and that if they insisted on attending they should buy a one-way ticket. On 01 March 1971, General Yahya announced postponement of the National Assembly for indefinite period. Disregard to the collective verdict of the people gradually threatened the fate of Pakistan to the process of eventual disintegration. The reaction in East Pakistan was immediate. Strikes, demonstrations and civil disobedience increased in tempo until there was open revolt. Prodded by Mujib, Bengalees declared they would pay no taxes and would ignore martial law regulations on press and radio censorship. The control of the central government ceased to exist in East Pakistan.

Bangabandhu's Historic 07 March Speech

Bangabandhu's historic speech of 07 March 1971 gave out a strong signal for independence movement. However, Mujib, Bhutto, and Yahya Khan held negotiations in Dhaka in late March in a final attempt to defuse the growing crisis; simultaneously, General Tikka Khan, who was commanding the Pakistani forces in East Pakistan, prepared a contingency plan for a military takeover. As it was, the talks broke down, and on March 25 Yahya Khan flew back to West Pakistan and Bhutto followed him the next day. When there

was a clear mandate, the military failed to install the democratically elected Government in office only because it wanted to serve its own interest. Thus West and East Pakistan once sprung from the common womb suddenly found them in bitter conflict.

Highlights on The Operation Searchlight

The Planning Process

Before maturing the plan, a few senior Pakistani officers in East Pakistan were pulled out for being critical of the military attack on civilians. They were Lieutenant General Shahabzada Yakub Khan, GOC of East Pakistan, and Vice Admiral Syed Mohammad Ahsan. Then Lieutenant General Tikka Khan took over as the Governor and GOC of East Pakistan. On March 17, General Hamid, Chief of Staff, Pakistan Army asked General Raja to plan the operation. In the morning of March 18, General Raja and Major General Rao Farman Ali wrote the plan. Highlights of the plan included the scope of the operation, pre-requisites for success, distribution of forces and tasks assigned to the individual brigades and units. General Hamid objected to the immediate disarming of regular army Bengalee units, but approved the disarming of the EPR, armed police and other para-military formations. The plan was amended accordingly and finalized for distribution.

Scope of the Operation

Scope and flexibility of "Operation Searchlight" had been unlimited. Primarily it aimed at eliminating the Awami League leaders and any civilians. It also targeted the armed forces personnel supporting the Awami League cause in defiance of martial law. Secrecy, surprise, deception and speed were emphasized upon at every stage of the operation.

Prerequisites for Success

Success of "Operation Searchlight" hinged upon many aspects as perceived by the Pakistani military leaders as mentioned below:

a. Operation to be launched simultaneously across the province and maximum number of political and student leaders and those among cultural organizations and teaching staff to be arrested.

b. Success in Dhaka was considered crucial. Dhaka Operation must achieve 100% success. Dhaka University would be occupied and searched.

c. Much liberty including greater use of fire authorized while dealing with the cantonments.

d. Operation to be executed with complete secrecy. All internal and international communications to be cut off, including telephone, television, radio and telegraph.

e. All East Pakistani (Bengalee) troops to be neutralized by seizing weapons and ammunition.

Available Pakistan Army Outfits in East Pakistan

Pakistan Army had 14 Infantry Division deployed in East Pakistan in March 1971. It had four Infantry Brigades and all of those commanded by the West Pakistani Brigadiers. Brigadier Jahanzab Arbab commanded 57 Infantry Brigade located in Dhaka, Brigadier Iqbal Shafi commanded 53 Infantry Brigade in Comilla, Brigadier Abdullah Khan Malik commanded 23 Infantry Brigade in Rangpur area and Brigadier A. R Durrani commanded 107 Infantry in Jessore. Each Brigade comprised usual slice of infantry, artillery and other support elements. Besides, West Pakistani Army personnel were also posted in all static units/installations.

Bengalee Units in East Pakistan

During March 1971, there had been a total of six (06) army Bengalee Infantry Battalions of which the 1 East Bengal Regiment (EBR) was in Jessore under 107 Brigade. The 2 EBR was in Joydevpur Rajbari area north of Dhaka, under 57 Brigade. The 3 EBR was in Sayedpur under 23 Brigade, and the 4 EBR was in Comilla with the 53 Brigade. The 8 EBR was preparing to move to West Pakistan and by then left its advance party. The East Bengal Regimental Center (EBRC) in Chittagong had nearly 2,000 Bengalee troops including the newly raised 9 EBR. The 10 EBR, a training unit comprised of University students was in the Dhaka cantonment. Bengalee officers commanded the 1, 2 and the 10 EBR, while the rest were under Pakistani officers.

Available Bengalee Forces of Other Categories

There has been nearly 34,000 Police members of all ranks almost exclusively Bengalee in East Pakistan. Several thousand Ansar and Mujahid members trained on basic military training were scatteredly deployed across East Pakistan. The East Pakistan Rifles (EPR) had around 15,000 members majority of whom were Bengalee. These forces were divided into 17 operational wings (battalion size) in 7 sectors located in Dhaka, Mymenshingh, Jessore, Rajshahi, Dinajpur, Sylhet and Chittagong. The EPR companies were often divided into small groups of sections/platoons and deployed in camps along the border. EPR Headquarters and 2,500 EPR troops were posted in Dhaka. The majority of the EPR officers were from West Pakistan.

Initial Resistance Phase - Dhaka Region

Dhaka – The Hub of East Pakistan

This region constituted the area bounded by Jamuna in the West, Meghna in the East and the Indian territory in the North. Being a "Vee" shaped sector the apex forms in the South where Dhaka, the geopolitical heart of Bangladesh is located. This is also known as the central region. The major river systems are the Jamuna, Meghna, Old Bramhaputra, Dhaleswari, Buriganga, Banar, Turag etc. The important places are Dhaka, Mymensing, Jamalpur and Tangail.

Dark Night of 25 March 1971 - Dhaka on Fire

Dhaka city had been the hub of Pakistan military carnage in the initial stage of the war. To resist the Pakistan military around Dhaka had been extremely difficult as compared to other areas. This is firstly because of their huge presence in the cantonment and secondly, the intricacies of fighting in built up area without skilled soldiers had been unrealistic affair. These are the reasons for which the Pakistan military could subdue entire city over night. 10 EBR was raised in Dhaka purely to train college and university students following the National Service Scheme launched in 1969. A Bengalee officer named Lieutenant Colonel Mueed Uddin was commanding the unit. Virtually, there was no Bengalee unit within Dhaka City that could have provided the leadership during crisis.Therefore, the resistance in the city area had been sporadic and limited only to self-defence in selected areas.

As part of the overall plan of "Operation Searchlight" on the night of 25 March, 57 Infantry Brigade was deployed in Dhaka with some additional troops. It comprised of 18 Punjab Regiment, 32 Punjab Regiment, 22 Baluch Regiment, 13 Frontier Force, 31 Field Regiment, 43 Light anti-Aircraft Regiment and one Platoon of Commando troops from 3 Commando Battalion located at Comilla. They were tasked to neutralize 2 EBR, Headquarters, East Pakistan Rifles (with 2500 Bengalese members), Reserve Police at Rajarbagh Police Line (2000 Bengalee members). 10 EBR

formed mostly out of the students was already disarmed. Detailed deployments in Dhaka including tasks were as under: 18 Punjab Regiment was deployed in Nababpur area of old Dhaka.

32 Punjab Regiment had to disarm the Bengalee members at Rajar Bagh police line.

22 Baluch Regiment was tasked to neutralize the EPR members at Pilkhana and seize wireless at Pilkhana.

31 Field Regiment was to secure Second Capital, Mohammadpur-Mirpur area.

13 Frontier Force was to secure Dhaka cantonment and act as reserve.

43 Light Anti-aircraft Regiment was responsible for the security of Tejgaon airport.

01 x Platoon of 3 Special Service group was given the task of carrying out raid in the residence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and apprehend.

01 Company each from 18 Punjab Regiment, 32 Punjab Regiment and 22 Baluch Regiment formed a Task Force and deployed in the university area.

Rumor spread in the city after dusk that Yahia Khan had left and Awami League volunteers put up some makeshift barricades in the streets. Although the operation was to start at 0110 hours, Pakistani troops moved out at 2330 hours from Dhaka cantonment as the Pakistani field commander wished to cut the reaction time of the Bengalee forces. Large military convoy carrying about 3 battalions of Pakistani soldiers rolled over the streets of Dhaka towards South in the city area. The silence was finally shattered when all their guns began to rattle around the sleeping city under chilly darkness. Earmarked units took up positions as ordered and started executing their tasks.

10 EBR was easily disarmed in the cantonment and later eliminated. 31 Field Regiment was deployed in the Second Capital of Dhaka city and secured northern part of the city. Pakistanis captured the EPR troops posted at Mirpur, the President House (presently called as Gonobhaban) and the Governor house without resistance, but many managed to escape while some were executed.

At around 0110 hours the Commando elements reached the residence of Sheikh Mujibur Rahman at Number 32 Dhanmondi. Tajuddin Ahmed including everyone had been insisting Mujib to move underground. But, he stayed back appreciating such course of action would bring widespread misery for the Bengalees. Failing to convince Mujib, Tajuddin along with Barrister Amirul Islam moved towards Faridpur for onward journey to India. By a swift Commando action, Major Billal under the overall command of Lieutenant Colonel ZA Khan arrested Mujib while 31 Field Artillery searched the house.

In a short while Iqbal Hall and Jagannath Hall were struck before other objectives in a crude manner using rocket launchers. 18 Punjab Regiment and part of 57 Infantry Brigade were committed to this area. Unexpectedly, American supplied M-24 tanks and guns led this column. Troops took over British Council library and used it as firebase to shell nearby dormitory areas. Caught by surprise, some 200 students were killed in Iqbal Hall, as shells slammed into the building and their rooms were sprayed with machine gun fire.

33 Punjab moved for Rajar Bagh Police line, where nearly 1100 police personnel used to reside. The police at Rajarbagh, aided by Awami Legue volunteers, put up a stout resistance with 303 rifles, but were eventually overcome and most survivors were captured and a few scattered away with handful of small arms.

In Pilkhana too, the situation was no different. There had been roughly 2500 EPR troops comprising 13 Wing, 15 Wing and 16 Wing. Sector Headquarters Sector Number 1 including Headquarters Wing, Signal Wing and Intelligence units were also based there. Sometimes in the first week of March, 22 Baluch Regiment housed itself in Pilkhana. Bengalee EPR officers were detained by the Pakistanis in Pilkhana and the troops were mostly ordered to stand down and relax. Only a few could sneak out to join Captain Halim's group in Manikganj and another group went to Narshindi under Subeder Gani eventually joined Captain Matin's contingent who happened to join the war while he had been on leave at Kishorganj. Troops of Pilkhana had done a splendid job by sending wireless message to all other sectors about the atrocities carried out by the Pakistan Army. Here in this encounter six Pakistani soldiers including one officer were killed.

Another contingent had been heading towards Bangshal fari. While going from Nawabpur to Bangshal end, the fari existed after crossing little ahead of Dainik Bangla office. As the Pakistani forces had been nearing the fari, unexpected firing engaged them from the front. Many were taken on the first attempt. A few police members along with Nadir collectively undertook the job. Nadir who happened to be a local terror suddenly turned into a different character and dedicated him for the country during the war. Later, he was caught by the Pakistan military and was never seen again.

In Ramna Police Station, the situation was totally different, as the Pakistanis had encircled the Bengalee members; they faced with unpredictable resistance from the police personnel. Next morning Dhaka city witnessed the marks of systematic mass slaughter. Deceased had been lying every after short intervals along the roadside like food staffs for the hungry scavengers.

Exploits of Junior Tigers - Joydevpur and Beyond

Joydevpur- gateway to Dhaka from the North is only about 30 kilometers away from the heart of the city is famous for its Rajbari. This area witnessed another action-packed episode following the insurrection of 2 EBR. Like elsewhere in Bangladesh, the Pakistani authority had been keen in dispersing this unit to different locations. By mid January, Alpha Company under non-bengalee Major Kazem Kamal was sent to Tangail, Charlie Company under Bengalee Major Nurul Islam was deployed in Mymenshing, Bravo Company (minus) under West Pakistani Major Azad Latif was at Gajipur Ordnance factory and Platoon from Bravo Company was sent to Rajendrapur Ammunition Depot. The Battalion Headquarters, Headquarters Company and Delta Company were located at Joydevpur.

The Commanding Officer Lieutenant Colonel Masudul Hassan, Second-in-Command Major KM Shaffiullah including 11 others were Bengalee out of total 17 officers in the unit. 2 EBR was better prepared than other units because of its close following of events and proximity to Dhaka. One company remained at Rajbari to be able to move in battle order in short notice and another platoon was to keep a close eye on Dhaka-Mymenshing highway. Other vantage points were also physically held for early detection and speedy passage of information.

Around 19 March, Brigade Commander Brigadier Jahanzeb Arbab Khan with 4

officers and 70 others visited Joydevpur. While visiting the unit, Commander suddenly got disturbed with a message. It conveyed that the angry mob erected a strong barricade near Joydevpur rail-crossing appreciating that the Bengalee troops are being disarmed. He ordered to take ultimate action for removing roadblocks when the tragic event unfolded. At the same time a lorry was coming from Tangail to Joydevpur for carrying ration for the troops stationed there. The mob stopped the transport and insisted them to join the fight against the Pakistanis. Failing to get any response, the agitated mob snatched their weapons. When this message reached the Commander, he straight way ordered fire for effect.

Maj Moinul ordered his troops to fire at a height good enough to avoid any kill. Brigadier Arbab got infuriated and ordered for shoot to kill. This time two were killed. Shockingly enough, after the incident, the Commanding Officer had to explain why there were only two casualties at the expense of 63 rounds of ammunition. He was failing to satisfy them on this point. In a bid to convince them, on 23 March, he moved to Brigade Headquarters at Dhaka and faced a grim fate. The Pakistanis made no mistake in retaining him in Dhaka and placed Commanding Officer of 32 Punjab, Lieutenant Colonel QA FMA Raquib, another Bengalee officer in his place, who proved his loyalty to the Pakistani authority by cracking down the Bengalee movement earlier.

In the name of pacifying the troops of 2 EBR, Brigadier Majumder was removed from EBRC. On 25 March at about 1100 hours, Brigadier Majumder visited the troops and made a short speech and returned to Dhaka cantonment. It appears, by all considerations, he had failed to appreciate the situation and got swiftly arrested by the Pakistanis and experienced the ruthless torture and ill treatment in the prison camp and interrogation cell in Pakistan. However, unlike many he was lucky to have returned alive after the independence in December 1973.

After the mass annihilation of 25 March, the ex Commanding Officer Lieutenant Colonel Masudul Hassan from Dhaka kept on informing Major Shaffiullah about latest situation. At this time, Lieutenant Colonel Rakib had been also giving a cold shoulder to the latest developments and restrained himself from giving any decision. In the morning of 26 March, suspicious conduct of the Non-Bengalee brigade operator alarmed the officers of the battalion. On the same day, the Pakistanis transported huge ammunition from Rajendrapur Ammunition Depot to Dhaka that gave rise to further speculations.

As the news of crack down reached the officers of 2 EBR, its officers unanimously decided to fight back. Major Shafiullaha, Major Moin and other Bengalee officers left Gazipur and planned to concentrate in Mymenshing. When entire 2 EBR revolted against the Pakistanis and vacated Joydevpur, ironically Sergeant Hemayet got isolated while he was patrolling along Dhaka-Tongi-Joydevpur road on 28 March 1971. While on duty, they heard sound of firing in the unit area. Appreciating this as Pakistani attack, Hemayet decided to hang around the unit premises until the situation was clear to him. When they were back to the unit line everyone left. He found no other Bengalee soldiers except two injured cases. However, Hemayet's forces killed remaining Pakistani soldiers.

On 27 March, Alpha Company commander Major Kamal a Non-Bengalee officer of 2 EBR was disarmed putting Lieutenant Golam Helal Morshed in his capacity. With assistance

from student leader Kader Siddiquee, on the same day, Tangail Police station was raided and huge arms and ammunition were captured. In Tangail district, Kader Siddiquee fought fiercely against the Pakistani forces and earned rapid circulation.

2 EPR Wing was stationed in Mymenshing. For last couple of weeks all troops were put on alert. Surprisingly, the Pakistani Wing Commander Captain Qummar Abbas instructed the Bengalee JCO to discontinue the duty. The instruction carried more worries than a sense of relaxation. Accordingly, the JCO did everything to alert and arm 220 Bengalee members. There were a total of 138 Non-Bengalees. This message was also passed down to the nearby Charlie Company of 2 EBR that came from Joydevpur. On the night of 27 March, the Non- Bengalee EPR members attacked Charlie Company location. Initially, the company suffered some set back but later the Company Commander Major Nurul Islam reorganized them and disarmed the Pakistani soldiers. On the other hand, the Bengalee EPR members retaliated very effectively and the fighting continued until 5'O clock next morning. In the process they killed around 120 non-Bengalees while rest surrendered. On the own side only a few were casualty.

Simultaneously, other EPR companies deployed in bordering areas of Nakshi, Karaitali and Langua were also asked to take appropriate measures at their locations. Then a plan of action was devised to protect Mymenshing Town with assistance from Mr Rafiquiddin Ahmed, the Member of National Assembly, Mr Sultan and Haatem Ali Talukder the local elite. Part of this EPR Wing remained in Mymenshing while remainders joined 2 EBR.

In the morning of 28 March, Major Shafiullah moved towards Mymenshing. In Mymenshing a retired officer named Major Nuruzzaman and Captain Matin joined. Captain Matiur also joined this group at Mymenshing who fled from 25 Baluch stationed in Jessore cantonment. Lieutenant Morshed from Tangail joined him near Muktagacha. Major Moinul Islam also joined with rest of the 2 EBR. By 1500 hours on the same day, Major Nurul Islam with his company also joined the main body. The inescapable situation thrust upon Major Shafiullah the leadership of the battalion. At this point of time, the officers of the unit charged with patriotism decided to attack Dhaka under Major Shafiullah. They considered it vital before the Pakistanis could bring in more troops from the west.When 2 EBR had been reorganizing at Mymenshing, Hemayet took over the control of Joydevpur by 30 March and his forces earned the title of Hemayet Bahini. He organized a brief training of around 3000 forces and let them move to their location to organize and fight the Pakistanis. With the assistance of the locals he had managed some arms and left for Gopalganj via Kapasia and had fought the Pakistanis from there.

Dhaka attack was planned on 01 April. 2 EBR was to advance from the east with an additional company under Major Shafiullah. Two mixed companies were poised at Mirpur, Mohammedpur and Dhaka airport areas to deceive about the direction of attack. One mixed company was at Gafargaon to deny use of railway line, one company at Tangail to deny Dhaka-Mymenshing road, one company each at Bahadurabad Ghat and Sirajganj Ghat to block enemy approaching from the north.

However, by 31 March the troops were in locations for the capture of Dhaka. On 31

March, when, the main attacking troops under Major Shafiullah reached Kishorganj, he received a note from Major Khaled insisting him not to undertake the operation right now. To Khaled's understanding, such an attempt would be premature and costly in terms of loss of lives. On this, Major Shafiullah abandoned his plan. After this, he kept one company along Dhaka-Narsingdi road, one company at Ashuganj and rest of the battalion reached Brahmanbaria via Ashuganj on 01 April.

At this point, Captain Shaigol, a Pakistani officer of 2 EBR who was deputed to Army Aviation Squadron defected from Dhaka to join the unit and reached Major Shafiullah. His father, a Pakistani officer Lieutenant Colonel A.M Shaigol served in 2 EBR from 1956 to 1958. His mother was from Bogra. Perhaps, maternal linkage and his memories with the battalion induced him to take such decision. The troops accepted him heartily. Although, his mysterious vanishing from a raid near Comilla airport had left his allegiance under serious qualm.

On the other side, 2 EBR troops operating on the western side of Dhaka fell back along Dhaka-Mymenshing road. On 01 April, this contingent ambushed one Pakistani military convoy bound for Mymenshing and inflicted huge casualties. On the same day, EPR members under Captain Matiur carried out an ambush near Panchdona in Narshindi area. Panchdona connected Kishorganj towards north, Narsingdi towards Northeast and Kanchpur to the south. Captain Matiur with his company was based in Karaitala village about 5/6 kilometers away between Panchdona and Palash Rupganj Thana. Pakistani troops started moving towards Narsingdi. Matiur planned to cause them maximum attrition as they try to enter Narsingdi and shifted his position to Karaitala, a place on Demra –Narsingdi road. They laid an ambush in Karaitala area keeping the main defence in Panchdona astride the main road. On 01 April, as the Pakistani convoy was approaching, Bengalee troops suddenly engaged them with volume of fire. The Pakistanis sustained huge casualties here. In the same evening, the enemy started non-stop pounding by artillery, resulting into forced withdrawal of Bengalee troops to Narsingdi.

Conclusion

Long domination by the West Pakistan left Bengalees with no option but to secede from its union which was though very costly in terms of lives and efforts. March 1971 therefore, occupies a glorious position in our history and it comes to us afresh every year to remind us of the legacy that had cost millions of lives. After Ayub Khan stepped down from power, General Yahya held the first ever General Elections in which Awami League won a landslide victory. But, Bhutto with a small coterie of military leadership didn't allow holding of National Assembly session for power handover. Arrogance and lust for power condemned the Awami League's hard earned election trimph and pushed the military to war against Bengalee people. The Bengalee people were rather caught unprepared in such a situation and could hardly match the quality of forces, armaments and also in preparedness. It took a heavy toll though gave them resilience and resolve eventually leading to victory. Since then, Bangladesh as a country and militarily have come a long way. Its transformation and growth in all sectors leading to current success is a matter of great pride for our nation.

BIBLIOGRAPHY

1. Arefin, ASM Shamsul. Mukijuddher Prekkhapate Bektir Obosthan(Location of Persons during Liberation War). Dhaka: University Press Limited, 1995.

2. Biswas, Sukumar. Mukti Juddhe Bangladesh Rifles o Annanya Bahini(Bangladesh Rifles and other Forces in the Bangladesh Liberation War). Dhaka: Mowla Brothers, April 1999.

3. Cutterbuck, Richard. Guerrilla and Terrorists. London: Faber and Faber Limited,1977.

4. Mahmudullaha, eds. Bangladesher Shadhinata Juddher Etihas o Dalilpatra(History and Documents of Bangladesh Liberaion War). vol 3. Dhaka:Howlader Offset Press, 1999.

5. Matinuddin, Kamal. Tragedy of Error. Lahore: Wajidalis(Private) Limited Printers House, 1994.

6. Souvenir on the Occasion of the 24th Raising Anniversary of 2nd Battalion, The East Bengal Regiment (Junior Tigers), 7th February 1973.

7. Salik, Siddiq. Witness to Surrender.Dhaka:University Press Limited,1996.

8. Shafiqullaha, Mohammad. Ekatturer Ranangon-Guerrilla Juddha abong Hemayet Bahini. Dhaka:Ahmed Publishing House, March 2004.

9. http://www.chowk.com/Views/History/Operation searchlight#comment-155601

10. http:// en.wikipedia.org / wiki / Operation_Searchlight

Brigadier General Md Sarwar Hossain, hdmc, psc *was commissioned in the East Bengal Regiment on 24 December 1986. He has attended a number of courses at home and abroad. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur and also has attended Higher Defence Management Course in India. He held various Command, Staff and Instructional appointments. He worked for the United Nations Mission in Kuwait and Ivory Coast. Besides serving in number of Infantry Battalions, Headquarters and Inter Service Organizations, he commanded 4 East Bengal Regiment. Presently, he is serving as the Commander of 305 Infantry Brigade at Rangamati.*

THE BLACK SWAN IN MILITARY THEORY

Air Vice Marshal Mahmud Hussain, ndc, psc

Standing upon the pedestal of the great German writer Carl Von Clausewitz, it is difficult to premise an original thinker of his stature even close to two centuries after his death in the field of military theory. Despite the richness of our knowledge in this respect of which there is no dearth, the poverty of military theory in its variations abounds in many ways. One of the reasons for such dichotomy is Clausewitz himself. His great seminal work On War which was published by Clausewitz's widow in 1832 a year after her husband's death is still considered the fountainhead of military genius with no comparable line of brilliant successors. This is true because despite its comprehensiveness, the systematic approach and precise style with which he dealt with the subject has given it a unique structuralist form. That is why, in its essence and destiny, On War has become the alter-ego of its own author. Additionally, the factor which has contributed to its sublimity, are the members whose field of knowledge he treaded upon. Soldiers are rarely scholars. However, despite being a soldier himself, his depth of knowledge and treatment of the subject raised him to the level of a philosopher. Such commitment to scholarship only comes through years of relentless pursuit of investigative research into finding ways of relationship between myriad constituents that make up the building blocks of a particular field of knowledge. Generals who adorn the highest positions in the military hierarchy hardly have time or panache for indulging themselves in such kind of scholastic and philosophic métier.

It is not to undermine other great military thinkers who either preceded or followed Clausewitz. Sun Tzu and Niccolo Machiavelli were superb but very limited in their treatment of war. Alfred T Mahan and Julian Corbett exercised their brilliance in altogether a different field, namely, sea power but their writing lacked the depth of Clausewitz's insightful perception of the relationship between war and politics. Later generations of military writers like Liddell Hart and JFC Fuller were merely his disciples expounding his theories in light of military history. Douhet and Mitchell, despite their excessive fondness for air power, failed to capture essentially its political significance. While other writers have their respectable emoluments as being analytical, none has so far been philosophically as erudite as Clausewitz.

The brilliance of Clausewitz lies in his comprehensive treatment of the subject of war. He drew his observations from history. But he reduced the golden rule of his vast ocean of knowledge into a single statement, "War is an instrument of politics". In the hypothesis of this statement lies his intellectual shrewdness. No matter what he wrote by way of strategy, attack, defense, military forces, war plans etc. it is in this singularly captivating statement that a scholarly reader is set into motion of thinking deeply. For Professor Ludwig Wittgenstein, I am hopeful he must have read Clausewitz, the statement is a riddle. The problem with a riddle is that it does not demand an immediate response but inspires enough interest in the mind to go searching for the truth. In such an expedition into the realm of philosophical investigations, arguments and counter-

arguments play with each other till one is tired of further experiment into falsifiability and either accepts the final conclusion or leaves it for conjecture in some other time.

Therefore, the task of this essay is to put to testability Clausewitz's most famous statement, "War is an instrument of politics". Many readers may find the exercise a bit time-consuming but it is worth undertaking because if Clausewitz is still relevant today, (he will be in future also), it is the elevation of this statement as an aphorism that marks his unique genius on a level as equal as the great physicist, Albert Einstein's statement, " Energy and mass are equivalent".

War is an instrument of politics. There are principally two heuristic words in the sentence --- war and policy. Taking into consideration the operation of linguistic as explained by its structuralist proponents, the role of the signifier and the signified is important as emblematic of the symbols surrounding a meaning. Here, the word 'politics' is the signifier and 'war' the signified. Thus, politics signifies war. In other words, the existence of war is rooted in the essence of political imperatives. However, the trouble starts how one defines the signifier whether in a stricter or narrower sense that eventually controls the space of the signified.

Clausewitz defined war as 'an act of force to compel our enemy to do our will… Force --- that is, physical force, for moral force has no existence save as expressed in the state and the law --- is thus means of war ; to impose our will on the enemy is its object. To secure that object we must render the enemy powerless; that in theory, is the true aim of warfare. That aim takes the place of the object, discarding it as something not actually part of war itself'. Thus, we see that Clausewitz conceived of war as something belonging to the material world. Its principal agent is the state and the means of physical force can only be executed by the military. Clausewitz has based his observations on the Napoleonic wars. As a prolific witness to the contemporary history of those times, the defeat of the enemy was only possible through the management of armed forces at the tactical level and that of military strategy at the state level.The state's sole aim was either to defend its territory or to occupy that of the enemy. His error lay in giving the highest concern to the role of the military in his theory on war. For lack of clear evidence of politico-civilian role in war till his time, such lapse in intellectual clarity is manifest in the book. The distinction between war and politics did not matter much as these two functions were normally combined in a single person as with Napoleon or Frederick whose military adventures were the empirical tools for his research. Even his predecessor Niccolo Machiavelli echoes the same instruction for the ruler of a state, "A Prince, therefore, should have no other object, no other thought, no other subject of study, than war, its rules and disciplines; this is the only art for a man who commands, and it is of such value [virtu] that is not only keeps born princes in place, but often raises men from private citizens to princely fortune. On the other hand, it is clear that when princes have thought more about the refinements of life than about war, they have lost their positions. The quickest way to lose a state is to neglect this art; the quickest way to get one is to study it". One is not surprised when not too long ago in history, John Adams, among America's first statesmen, answered to a query from his wife in a similar refrain, "I must study politics and war, that my sons may have liberty to study mathematics and philosophy, geography, natural history, and naval architecture, navigation, commerce and agriculture, in order to give their children a right to study painting, music, architecture, statuary, tapestry and porcelain". What all these great thinkers ignored is the pervasiveness

of war and its effects on society. With all his depth and intellectual sharpness, Clausewitz's thinking was intensely parochial, conceived as it was with the tools of land operations. Machiavelli's prince, if he followed the great thinker's advice, would no doubt, make a fine general in the field but would certainly fail to know his people well. On the other hand, John Adam's posterity would despair of not thinking of war during their time of enjoyment of painting, music and arts in the face of subsequent hostility from the world.

Since Clausewitz's times, extra-ordinary changes have come into the life of man and the state. The economic, cultural and scientific changes have impacted upon our psyche in the ways we think of our society and its inclination towards war. War is no longer treated as the only business of the professional soldiers. The advent of air power erased the distinction between the destruction of enemy's army and its civilian population. Destruction of the enemy army's will power which Clausewitz saw as the aim of war was suddenly changed into breaking the morale of enemy's population. But to strike at the enemy population was fraught with moral hazards and thus required approval of greater political statesmanship. Since WWI, war has started becoming more and more a careful precincts of the politicians, but in becoming so, the dual function of prince-commander has undergone radical changes. No longer, for a politician, the study of warfare is the principal subject. The task of studying complex military environment has been relegated to the generals, admirals and air marshals. On the other hand, the state rarely endorses the function of politics to be taken seriously by the military commander. This division of labor in the relationship between war and politics is what makes the classical theories on war a fertile ground for raising polemical problems.

There is a commonplace agreement among the scholars that a theory must be comprehensive, that is, it must be able to communicate all aspects of its subjects; be based on the constants or the absolutes of its subjects; and constantly pass the test of reality. Clausewitz, who must have studied and been influenced by Immanuel Kant, the great German philosopher and his philosophy of idealism, wanted to give war a permanent form of structure. But the difficulty lies in trying to do so with such a practical subject as war. Reality constantly changes and there has been revolutionary change since his days in military and political ideas. During his time, mercenaries were part of regular armies belonging to a state. These hired soldiers had neither political ambitions nor military commitments. Their purpose was different from the attitudes and refinements of regular army trained to fight a war for preserving the sovereignty of a state. In modern times, non-state actors fighting against states pose a different theoretical problem. The relationship between theory and its agents generates imponderables. Therefore, theory must be dynamic. Its excellence lies in being open and flexible enough to accommodate the imponderables or hitherto unknown yet retain its eminence in being original and unique. Clausewitz's formulation of war as pure reason is what gains momentum in subsequent centuries of practical changes in the institution of military, politics and human society.

The profusion of democracy, in modern times, has led to a new understanding in the meaning of war and politics. Moreover, the formation of alliances involving states spanning the whole world has brought to the fore-front the role and duty of political leaders in employing war as a measure of their objectives. The classical writers on the theory of war mostly based their observations on local or at best, continental conditions.

Clausewitz and his monumental work were no exception drawing examples from European politico-military scenario. However, its contents could easily apply to other areas of the world given the historical circumstances of those times. It must be noted that the passion for war amongst the political masters in a democratic environment is of a rather cautious approach than it would be otherwise in a dictatorial atmosphere. The two world wars have amply proved that war as a subject needs different kind of treatment. The formation of world bodies like League of Nations and the United Nations has made war an instrument of international politics which has an altogether different shade of understanding than what was conceived by Clausewitz in its national outlook. The loss or gain of territory was no longer the object of the great wars. In narrower sense, it was the adjustment of the balance of power on global scale; and on broader sense, who would exercise control international relations as superpower. The military arm that came to be the deciding factor was air power. The use of atomic weapons through the medium of air brought about the relevance of superior judgement of the political masters not only in taking strategic but also operational decisions which had hitherto been mostly the domain of the military commanders. Subsequently, during Korean and Vietnam Wars, the use of air power in the hands of political masters ignoring the advice of military commanders resulting in apathy between the two professional groups led to the re-formulation of the theory of war in later decades. Gulf wars and US involvement in Global War on Terror (GWOT) demonstrated the importance of the relationship between war and politics to be evaluated in a different light. The distinction between political masters and military commanders seems to have gaining clearer grounds of demarcation. It is to say that war is too complex a business to be left alone to the soldiers. On the other hand, it does not teach us much by assuming that politicians are poorly informed on matters military. For what they have is the national obligation. Their constitutional authority to control the military establishment must train them to select the best and sharp minds as their military advisers. It is always necessary for a President or a Prime Minister to acquaint himself with the task of selecting the best men as his services chiefs.

Therefore, the part played by a modern day prince without being a man in uniform is second to none. He is the master of politics but he has attained that position by virtue of popular vote and therefore, reserves the right to decide on issues of war on their behalf. But democratic leaders are also wary of people's regard for peace over war. As such, their decision to go to war requires popular mandate which is not so easy to come by. This is also the reason that democracies do not fight wars with each other. This also contradicts what Clausewitz said, "War has its own language but not its own logic." By 'language' Clausewitz refers to the means or methods of conducting war which is the business of the military. By 'logic' he means the purpose within a political milieu. The failure of logic to come to the rescue of rationality might have been the case with Napoleon, Frederick or Hitler but with ever increasing number of states becoming democratic, logic needs its strength to be supplied by the passionate mandate of the populace.

The other factor which calls to serious re-thinking of Clausewitzian concept is the process of 'Globalism' of militarism. Peace-keeping operation is the tool to contain atrocities and bellicosity on global scale. Here individual armies are not pitted against each other with a view to embarking upon territorial conquest. The moral of such operation is different from that of classical engagement of

military units. The purpose is not enforcement of popular will through military means rather containment of animosities between warring sections of a society through negotiations of a third party which is a politico-military entity composed of military outfits of states working under a well-defined United Nations mandate. The qualifications required for such peace-keeping operations are diplomatic skills and negotiating acumen. The ability to bring to reconcilement opposing factions is what military commanders are expected to demonstrate in strangely unfamiliar environments. The strategy is not to equip oneself with the compulsion of bringing the right amount of forces at the right time but to understand the peculiar circumstances of social disruption of peaceful co-existence of the affected parties. It is a quasi-political role that even a minor military officer has to perform with great talent and finesse.

Clausewitz believed in physical strength to be of supreme value in war effort, but when the ultimate universal goal is to render animosity between rival factions neutral, the stake-holders tend to exercise moral persuasion as the most practical tool to achieve peace-keeping objectives. The underlying principle of difference in the engagement of military forces on both occasions is what constitutes the essential criterion of military significance. Traditional military conflicts train the mind of soldiers how to fight a war whereas the same spirit in peace-keeping role intervenes on behalf of the conflicting parties how not to fight a war.

Military officers who specialize in peace-keeping operations and are enamored of its intrinsic value are unlikely to make Clausewitz an object of serious study. However, that also reduces their capacity to relate politics with war. It is easy to comprehend the necessity for war as the outcome of political decision at state level but to send one's own military personnel to keep peace at some distant land has to find its moral justification in the duty to mankind. Hence, the military as an institution is not only meant to be raised to protect the political boundaries of a state but also to protect the foundations of apolitical peaceful co-existence of human beings.

The title of this article is given as the "The Black Swan in Military Theory". It sounds rather unusual and strange. This last section of the essay is an attempt to give meaning to the title in relation to the contents as covered in the afore-mentioned paragraphs.

The existence of swans as white birds is so commonplace that people believe that it is an unassailable reality. However, the occasional sightings of black swan assault upon our conviction that all swans are white. But the significance of such conviction does not lie there. It lies somewhere else. Nassim Nicholas Taleb says, "It illustrates a severe limitation to our learning from observations or experience and the fragility of our knowledge. One single observation can invalidate a general statement derived from millennia of confirmatory sightings of millions of white swans. All you need is one single (and, I am told quite ugly) black bird."

On War by Clausewitz is a very comprehensive treatment of the subject of war but it is also not a well-rounded, all-inclusive holistic approach to the problem. Its classical style and investigative research is impressive and the statement that 'War is an instrument of politics' still remains the cornerstone of our faith in the relation between war and politics. But changes in times and involvement of the military forces in operations other than war, the advent of air power, the reach of maritime forces, the global war on terror, and the civil-military co-operation in civic matters have shown that there is a paradigm shift in our

understanding of treating war as an instrument of politics. The striking example of reversing the statement manifests itself through the incidence of recent Gulf wars.

Gulf wars have clearly demonstrated that politics can be used as an instrument of war. The United States wanted to use its political clout to achieve its military objectives. The US military presence in the Middle East was to preserve its oil resources and that could only be achieved through political superiority that US had in achieving military goals. The Gulf wars, in true Clausewitzian sense, were no war at all. It was a one-sided affair right from the onset of US political initiatives as an instrument of proving its military muscle. Therefore, politics became a tool for perpetuating military gains.

Thus, we see that how the appearance of Black Swan is constantly changing our perspectives about war. It is for the military theorists to take lessons from the contemporary military conflicts and re-vitalize the many classical theories on war. The idea that 'one size fits all' is no longer tenable. But how the new generation of military thinkers will address this evolving dynamic field of thought will largely depend upon their commitment to taking up the challenge with renewed and fresh vigor of intellectual and academic zeal.

BIBLIOGRAPHY

1. On War by Carl Von Clausewitz; edited and translated by Michael Howard and Peter Paret. (1989). Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

2. The Prince by Niccolo Machiavelli; translated and edited by Robert M. Adams. (1992). W.W. Norton and Company, New York, London.

3. Strategy by B.H. Liddel Hart. (1967). A Meridian Book, USA.

4. War and Politics by Bernard Brodie. (1975). Macmillan Publishing Co., Inc. New York.

5. War, Ends and Means by Paul Seabury and Angelo Codevilla. (1989). Basic Books, Inc., Publishers, New York.

6. The Black Swan by Nassim Nicholas Taleb. (2007). Penguin Books, Great Britain.

Air Vice Marshal Mahmud Hussain, ndc, psc *joined Bangladesh Air Force on 19 September 1979 and commissioned in the GD(P) Branch on 01 February 1981. He has flown 3,500 hours on both rotary-wing and fixed-wing aircraft. He is a graduate of both Staff College and National Defence College, Mirpur. He also completed his staff course from the Air University, United States obtaining a Masters in Operational Art and Science. He completed his M.Phil from the National University, Bangladesh in 2007. He served in two UN missions; as a military observer in the Former Republic of Yugoslavia in 1993-94, and the first Contingent Commander of Bangladesh Air Force in the Democratic Republic of Congo in 2003-2004. Presently, he is deputed to Civil Aviation of Bangladesh as its Chairman. He is also the Chairman of the Steering Committee of COSCAP-SA which is the regional forum of the Directors General of SAARC Civil Aviation Authorities.*

INFLUENCE OF HUMAN NATURE ON INFORMATION WARFARE

Captain Mohammad Ziauddin Alamgir, (L), psc, BN

Introduction

Accurate and up-to-date information have always been crucial to military operations. Nearly 2,500 years ago the great Chinese strategist Sun Tzu said, "If you know the enemy and know yourself, in a hundred battles, you will never be defeated……...". Since the first naval battle fought between the Greeks and Syracusans, naval warfare has gone through Wooden-Warship age, Sail-Warship age, Steamship age, Cannon age, Guided Missile age and Electronic Warfare age and has entered into Information Warfare (IW) era.

In the information age, the influence of human nature in warfare has become ever significant. The factors of success in IW are no more the province of charismatic leaders or chance but network leadership. IW, human nature and leadership are inseparable entities in the present day warfare. Understanding well the nature of different peers (people) a net-centric leader can contribute towards the winning of hypo-real war. This paper is to discuss the influence of human nature and leadership on information warfare.

Concept of IW

IW may be defined as any action to deny, exploit, corrupt or destroy the enemy's information and its functions; protecting ourselves against those actions and exploiting our own military information and functions. It encompasses any hostile activity directed against our knowledge and belief systems. Cyber war, the newest subset of IW, needs no battlefield: it is fought in cyberspace. Cyberspace includes information itself, the communication nets that move it, and the computers that make it useful. Cyber war operations can blind us electronically and may change the definition of what is a hostile attack and what determines defeat or victory.

IW is not a new concept. Even the primitive peoples, armed only with bows and arrows, had a very real understanding of the value of information. From the primitive man to the man of our time, we can see that there has been an evolution in the amount of available information and the degree of dependence we have in relation to the information that we do not control. Since 1960s the mass media could make a decisive impact on the political decision-making process.

The recent boom of computer and information based network on the Worldwide market has led to an explosion of computer based technologies and capabilities. The Information Superhighway has reaped impressive benefits in linking all areas of the world. The linking of these information structures and expended reliance on computers is also sending shockwaves through the Armed Forces.

Today, the launch of nuclear tipped missiles might require minutes to detect, but information assault can be completed in seconds; and remain undetected until its consequences become painfully apparent. Failure to treat information assault as a potential threat could prove to be catastrophic.

The major feature of IW is that there is no need for weapons of physical destruction to conduct IW. Since information assumes visible form as data, most tools used in IW are of the non-violent type. Information age weapons are equalizers and can negate the principle of mass. Cyber war needs no battlefield and therefore no specially trained military organization. The initial offensive strike in a quiet cyber war would be hard to detect and to defend against.

IW emphasises control and seeks to paralyse. The tools of IW are limited numbers of inexpensive computers linked via Global Communication Systems. Knowledge is the ammunition of IW and it is inexhaustible. Knowledge diffuses and redistributes power to the weaker actors. It redraws boundaries and time and space horizons.

Concept of Human Nature

Sun Tzu made it clear that warfare is not about equipment or armies. It is about influencing peoples' minds (human nature). Warfare is about achieving behaviour change and the highest art to accomplish that is to change it without a single shot being fired. Human Nature has become more significant in the present age of information era. Clear understanding of human nature has become obligatory for the commanders to shape the battle space in their favours.

Human nature may be defined as the shared psychological attributes of humankind that are assumed to be shared by all human beings. Human nature is the fundamental nature and substance of humans, as well as the range of human behaviour. Human behaviour is believed to be invariant over long periods of time and across.

Different Cultural Contexts

Greek historian Thucydides argued that people were motivated by calculations of self-interest along with other non conscious factors like fear and honour. Emotion, stress, and hormones are important players in human decision making. Variations in their biological inheritance among different peoples affect the mechanisms involved in decisions making process. These biological factors and the way in which they vary from person to person can affect the political and military behaviour of the states.

The characteristics of the human brain are to some extent determined by heredity. Because of their differing hereditary factors different people process information differently. The ability to specify the ways in which different people make decisions differently enables us to deal with solving the problems of putting right man in the right place.

The human mind has functions and structures that are the result of genetic inheritance, as well as its encounters with the environment. Human cognition is the product of the interaction of inherited functions and structures with the environment. The social environment can strengthen or weaken inherited mental predispositions, and inherited predispositions can shape the social environment.

Concept of Leadership

Leadership is about how we use the influence and trust that people grant us to define necessary change and shape the future direction of the organisation. Leadership is a key requirement across all levels within an organisation. The role of leaders is to constantly, and with large amounts of passion, communicate and raise the profile of meaning,

articulating it in a manner that is easily understood and wholly relevant. Leaders inspire the imagination of followers and believers. Leaders provide their teams and the individuals with the strength and motivation to create and maintain momentum throughout the journey of achieving the vision, strategy and targets of any organisation.

The basis of leadership among Greek warriors was "A first among equals". Such leadership was a product of a culture of equality and mutual accountability. The traditional concept of leadership was founded upon the concept of great man leadership model. In this concept individual qualities of the leader was important criteria. The presence of the leader was considered the decisive factor of winning the battle.

In NCW leadership is considered both as born and nurtured. Here leadership is considered as a product of biological and environmental factors. The personality associated with leadership is compelling and growing. As the mental and physical capacities of individuals are widely varied their different leadership capacities are also vary innately. In NCW concept, leadership is a network effect that can result in highly responsive and effective leaders. If networked organisations can be designed for certain leadership roles and competencies that can be measured, evaluated, and improved upon, then leadership ceases to be an ineffable quality, but becomes a tangible asset that can be learned, improved upon, and replicated.

There are at least eight different kinds of leadership roles in a networked organisation.

The Exemplar or Alpha Members are the role models that others imitate. Sometimes their role can be simply symbolic, even ceremonial, but they are nonetheless important in setting the tone and culture of the organisation.

The Gatekeeper Role is a combination of Truth-Teller, applying the standard for Admittance, and Enforcer, denying admittance to those parties that fail the test.

The role of the Visionary Leader is to imagine futures, determine what is limiting about the present, and show what is possible in the future. The visionary leader imagines plays a critical role in moving networked organisation in new directions.

The Truth-Teller entails the very challenging task of identifying free riders and cheaters. The truth telling goal is to provide authenticated and accurate reporting of the outcomes of missions.

The Fixer is an individual who knows how to get things done and measures him or herself not just by how many people they might know, but rather how they can get things done that others cannot.

The Connector maintains connection with a large and highly diverse number of members. They are known for having numerous friends, connections.

Enforcement can mean physical coercion, but more often entails psychological or peer pressure. Though force and military means are the enforcement methods of last resort, but are necessary in order to buttress other forms of enforcement.

In order for a network to grow and evolve, it must be able to add new members and reach across network boundaries in order to do so. The facilitator creates communities or sub-networks that provide the greatest form of network value.

Influence of Human Nature

The world is now in net-centric era. USA and allied forces are undoubtedly most incomparable force and is equipped with most sophisticated equipment and tactics. Then why they have failed in Iraq? Can all these high tech warfare and its all associated revolutions override a human nature; his brain, skills, competencies, moral, motivation etc? The answer is simply no.

Sun Tzu argued that "Winning 100 victories in 100 battles is not the exponent of excellence. Subjugating the opposing army without a fight is the true exponent of excellence." How it can be achieved? Victory can be achieved without any bloodshed by exploiting human nature of both own forces and that of enemy.

In the present high tech war where information plays a vital role the importance of human factors has been exemplified in many folds. What changes has taken place from industrial to information era?

Laboratory based scientific explanations of how people think, behave and react are available now.

Information collecting, processing and assimilation has become too fast and accurate.

Communication weapons have dominated the battle field.

War has become highly technical and knowledge has become decisive factor.

Psychological warfare has come to the front place.

IW is not fully military in nature. It may involve civilian organisations also.

Now let us examine what are the implications of these changes.

"Putting the right man in the right place" is the first challenge we are to meet in the information age. Psychological background plays a vital role here. Human nature influences the spirit of armed forces. Spirit can determine the outcome of war.

Understanding the human nature helps to reduce side effect of the mental activity of combatants, provides the psychological basis for sound decision making, develops subjective and objectives morale building factors and helps to predicts effect of the social psychology on war.

In spite of all the technological advances, the recurring question that has continued to echo through the halls of our castles alike since man began his violent journey into warfare is Who is the enemy? How he will fight? And most importantly how will we fight? The victory depends how best these questions could be answered. Clear understanding of human nature is essential to answer these questions and win the victory.

Influence of Leadership

The key to victory in war lies in human policy decisions rather than technology. Genuine advantage does not depend on the leading technology but on the leading ideas. History has given evidence to the fact when some new technology brings mankind brightness, a shadow is cast simultaneously. Advanced electronic computers and information technology has linked society and the army to an integrated network; the result is very high efficiency and great fragility.

Success in future wars will require armed forces with open, adaptable organisations that can react more quickly to changes than can the competitors. The effective functioning of these organisations will depend on the fact how it is being led. Leadership was vital in the age of sail and will be vital in the future for outcome of any war.

Role of the leadership in the armed forces to guide his men to fight against the speed, precision and beyond comparisons lethality weapons with most precise; exactly on target, and unmatchable to any machines will be different in the information age. High tech environment brings large mental pressure on the leaders. Massive destruction causes threatening effect. The mental quality of the leaders in information age will be challenged under the disturbance of psychological attacks on their mental stability.

Age, physical structure, personality, knowledge and skills are all contributing factor for optimisation of leadership. In net centric warfare military leaders will have to perform multiple roles. It is unlikely for one leader to perform all roles with equal efficiency. It implies that command team needs to be formed to complement each others' deficiency.

The form of warfare is increasingly becoming informational, analytic, sense making and collaborative. Communication and interaction skills of leaders are becoming increasingly important. It implies that Napoleon leadership concept need to be moulded to face the new challenges. Then what are the new challenges? There are basically four changes that have raised a set of profound challenges for military leadership:

Development of electronic and information technologies.

Changes in the environments, internal structures, and tasks of contemporary militaries.

Entering into open systems, capable of being aligned in loose, modular forms of temporary frameworks.

Growing Complexity in the Roles of Military Leaders

To face these challenges military leadership needs new skills and capabilities. The new skills required of military commanders are: negotiation, liaison, persuasion and teamwork. In IW future commanders are represented less as leaders than as managers or engineers of information technology, who stay in a control room or vehicle, and are physically and socially distant from the majority of their troops.

The governing depiction of the "digitized" army or of computer warfare clearly deemphasises the social and human elements of the military, and presents a very "cold model of technical managers" in place of conventional military leaders. But a close studies on contemporary armed forces reveal the continued need for regular forces performing the conventional tasks.

The interaction between technological innovations and human and organisational features will eventuate in a less digitized military reality than that envisioned by the technologically driven scenarios. Military leaders can no longer depend only on authority, professional expertise or tactical ability. There is also a need for sensitivity, awareness, and a familiarity with the norms of the environment within which they operate.

Conclusion

The destructive power of the military is characterised by the existence of three major types of weapons that succeeded one another in importance within the age-old offensive versus defensive conflict: Obstruction Weapons, Destruction Weapons and Communication Weapons each of these types of weapons

dominated a particular kind of confrontation: siege warfare, manoeuvre warfare and shock and awe.

The objectives of the wars were imposed by the predominant socioeconomic structures in the different epochs. Pre-industrial wars were generally materialised by the conquest and/or control of territorial resources. Industrial-era wars had as their objective the reduction and limitation of the opponent's production resources. Supposing that this analogy is valid, future wars will be fought to ensure control over data, information, and knowledge.

Accurate and up-to-date information have always been crucial throughout the transformation of naval warfare from wooden-warship age to Information Warfare era. In the information age, the influence of two inseparable entities; human nature and leadership in warfare has become ever significant and a war winning factor. There has been an evolution in the amount of available information and the degree of dependence we have in relation to the information that we do not control. Information Superhighway along with expended reliance on computers has turned warfare into real hypo warfare.

Sun Tzu made it clear that warfare is about influencing human nature. It has become more significant in the present age of information era. Clear understanding of human nature has become obligatory to shape the outcome of battle in favour of the commanders. Understanding the human nature enables us to put right man in the right place. It helps to reduce side effect of the mental activity of combatants, provides the psychological basis for sound decision making, develops subjective and objectives morale building factors and helps to predicts effect of the social psychology on war.

Leaders inspire the imagination of followers and believers and provide their teams and the individuals with the strength and motivation to create and maintain momentum throughout the journey of achieving the vision, strategy and targets of any organisation. Contrary to the concept "A first among equals", in information era leadership is considered as a product of biological and environmental factors. But still key to victory in war lies in human policy decisions rather than technology. Leadership was vital in the age of sail and will be vital in the future for outcome of any war. Communication and interaction skills of leaders are becoming increasingly important as such Napoleon leadership concepts need to be moulded to face the new challenges.

To face the new challenges, present high-tech information age suggest that some changes need to be brought in to win the next war. To prepare for the battle in virtually un-limited battle space, under the shadow of information flow, contending for the control of information following needs active considerations:

Transformation of Hierarchical Command and Control Organisations into highly agile, self-synchronising networks.

Shifting Leadership Emphasis to more on governance than of command.

Agile Command structure to adapt to the different circumstances of the mission from unilateral humanitarian missions to coalition-based major combat.

Selection of new kinds of competencies and their rapid incorporation into the training of all recruits.

Attaching importance on Organisational Learning and Innovation Adoption.

Study of human nature and psychology by the military leaders.

BIBLIOGRAPHY

1. George, Bill. "Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value". San Francisco, CA: Jossey Bass. 2003.

2. Gaulin and Mc Burney. "Social Behaviour." Psychology: An Evolutionary Approach. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 2000.

3. Dunbar, Robin. Grooming, "Gossip, and the Evolution of Language". Cambridge, MA: Harvard University Press. 1996.

4. Damasio, Antonio. "Lookin-g for Spinoza, Joy, Sorrow and the Feeling Brain". Orlando, FL: Harcourt. 2003.

5. Sugiyama, Tooby, and Cosmides. "Cross-Cultural Evidence of Cognitive Adaptations for Social Exchange among the Shiwiar of Ecuadorian Amazonia." PNAS. #3529.

6. Clippinger, John H. "Biology _ of Business: Decoding Natural Laws of Enterprise". San Francisco, CA: Jossey Bass. 1999.

7. Chomsky, Noam. "New Horizons in the Study of Language and the Mind." Cambridge, MA: Cambridge University Press. 2000.

8. Alberts, D.S, Gartska, J.J., & Stein, F.P. "Network Centric warfare: Developing and leveraging information Superiority". Washington: CCRP. 1999.

9. Arquilla, J., & Ronfeldt, D. "The advent of net war". Santa Monica, CA: Rand Corporation. 1996.

10. Bernays, E. "Propaganda." Brooklyn, NY: Publishing. 1998.

11. Carruthers, S.L. "The media at war." Houndsville: MacMillan Press. 2000.

12. Libicki, M. "What is information warfare?" Washington: National Defence University. 1995.

Captain Mohammad Ziauddin Alamgir, (L), psc, BN *was commissioned in 1985. He is a graduate of BUET in Electrical and Electronics Engineering. He did Weapon Electrical Application Course from Royal Engineering College, Manadon UK. He obtained the degree in Masters of Defence Studies from National University and Masters of Science in Electrical Engineering from BUET. He is a graduate of DSCSC and Naval Command College, China. During his long career Capt Alamgir performed Command, Staff and Instructional duties at various levels. He served as Senior Instructor MIST, Commanding Officer BNS ULKA, Flotilla Electrical Officer, OIC Workshop and OIC Training School etc. Presently he is serving as Director, Naval Weapon and Electrical Engineering at NHQ.*

GRAND STRATEGY FOR A SMALL COUNTRY

Group Captain Md Shafiqul Alam, psc

Introduction

A country, be it small or big, should formulate its strategy to achieve the overall national objectives. To pursue its international policies for maintaining sound relations with other states a country also formulate and pursue its strategy. However, in the question of Grand Strategy formulation one may think it is the big country's aspiration and a small country should not be the party to it. During the Cold War era it was the only subject for the USA and the Russia. But with the end of Cold War and the emergence of a unipolar world made the Grand Strategy process elaboration difficult for great powers. Now the debates are around the way in which the Grand Strategy are still very active and spirited among both practitioners and scholars. The fact is that a great power must have a Grand Strategy in order to preserve its role and to pursue its national interests, but should a small country ignore it or should pursue it as any great power? Should Bangladesh being one of the small countries in size, but with big population and emerging economic power, pursue its grand strategy. This article would discuss whether small countries need a Grand Strategy or not. The general concept about the small country and the Grand Strategy will be discussed and then various attributes of Grand Strategy will be linked with the features of small countries to explore the options.

Small Country

To address the questions in regards to formulating Grand Strategy, first we have to define what a small country is and when a state is to be considered small. There are several criteria and indicators which may help us to identify a small country like - population, GDP, military assets and size of the country itself. However, smallness should be examined under the theory of relativity, it is small compared to what? Like Bangladesh according to these criteria is a small country compared to India but it is bigger than Nepal or Bhutan. That is why physical measurement is not enough to determine if a country is small or not. A crucial moment for determining how big a small country is the distribution of the state power in the country, in the region (among its neighbours) and how it acts on the international arena. From this perspective, a country can be considered small on the following attributes:

a. If it is suffering a shortage of autonomy.
b. If it has no influence on other states.
c. If it depends (economically, militarily etc) on other countries.

Grand Strategy

Grand Strategy comprises the "purposeful employment of all instruments of power available to a security community". The role of Grand Strategy is to coordinate and to direct all the resources of a nation or band of nations, towards the attainment of the political objectives of the war. Grand Strategy should both calculate and develop the economic resources and manpower of nations in order to sustain the fighting services. Grand Strategy should also regulate the distribution of power between the several services, and between services and industry. The fighting power is but one of the instruments of Grand Strategy. Grand Strategy has considerable overlap with

foreign policy, but Grand Strategy focuses primarily on the military implications of policy. It is typically directed by the political leadership of a country with input from the most senior military officials. The development of a nation's Grand Strategy may extend across many years or even multiple generations.

On the other hand, the fundamentals of strategy are bounded by the war, but the Grand Strategy looks beyond the war to the subsequent peace. It should not only combine the various instruments, but so regulate their use as to avoid damage to the future state of peace, security and prosperity. Some have extended the concept of Grand Strategy to describe multi-tiered strategies in general, including strategic thinking at the level of corporations and political parties. In business, a Grand Strategy is a general term for a broad statement of strategic action.

Need for Grand Strategy

Considering the definition and all attributes of small countries, a legitimate question arises: Does a small country need a Grand Strategy? The answer of this question can either be positive or negative. Both the probabilities provide an idea to formulate a country's strategy:

a. According to the definition above, a small country would lack human resources, industrial and military capability. Thus, it could be presumed that even if a small country designs a Grand Strategy it will lack the resources to implement it. Therefore, it would seem that small countries do not need a Grand Strategy. However, a country that fits the criteria of being small country still has its national interests. Of course, these interests will be very minimalist in comparison to a great power strategy; mainly they will focus on national survival as an independent and self-governing country. As the Grand Strategy provides the linkage between national interests and actions to be undertaken to achieve these ambiguous interests, it is a useful tool that a country must design. Effective Grand Strategies can:

(1) Provide a unifying purpose and direction to national leaders, public policy makers, allies and influential citizens in the furtherance of mutual interests.

(2) Reduce the risks of chaotic decisions.

(3) Guide for a systematic and calculated approach towards the national interest for consolidating the efforts of all interested actors and might have a significant impact in the case of small countries.

(4) Helps to save the country's limited resources by supervising their distribution. Thus, the probability of the achievement of its national interest under the Grand Strategy scenario is more likely than in its absence.

b. At a first sight, a Grand Strategy might not seem absolutely necessary for a small state which lives in stable security circumstances. It may be favoring a state without too much to fear and threats and with no pressing wants to remedy, especially if its system of governance is efficient and capable of rapid consensus based action. Unfortunately, this seems to be the case only of few small countries (Monaco, Luxemburg, Norway) which are typically outliers from the general rule. As such, a country may not need a security Grand Strategy because it is secured enough which is very unlikely for the most of small countries.

Developing Grand Strategy

Grand-strategic decisions are difficult because they deal with intangibles; they require leaders to think conceptually and to visualize the effects of a series of seemingly unrelated actions. To formulate the Grand Strategy a state should consider the following:

a. To present a functioning Grand Strategy, the national political process must achieve consensus amongst the polity that will implement it. This political mature approach seems to be less possible in small countries with unstable domestic political systems. A general view to small countries shows that political instability is one of the most pre-eminent features of a small country. That is why a small country under the conditions of instability will be just unable to follow the course designed by its strategy; so the efforts and resources used to elaborate such a strategy will be wasted in vain.

b. Grand Strategy requires great discourse. A small country needs prominent leaders who know how to use words to transform strategic reality. Words speak to the emotions and there must be a definite identity component of a leader that will act as magic. Unfortunately, just very few countries are lucky enough to have this kind of leaders.

Scenario for Grand Strategy

There could be three different Grand Strategy scenarios to which small countries recourse in order to ensure its national interests. These three alternatives also imply a general characteristic of the strategy. Broadly it suggests that it cannot be aggressive and the country cannot expect to take a leading role. The alternatives are:

a. **The Strategy of Neutrality.** The neutrality has been seen as the alternative to military alliances and it is viewed as a safety belt if collective security failed. In realist accounts, neutrality was determined by exogenous and material forces – imposed by great powers or dictated by geography or small power status. The commonly criticism to the strategy of neutrality was claimed by the realist theory and has dominated mainstream understanding of neutrals as small, weak, amoral and passive actors in the international system. The strategy of neutrality is not working without the recognition of great powers and the ability to stay neutral was dependent upon geo-strategic considerations rather than rights. The neutrality is often chosen as an answer to the proximity of two great powers.

b. **The Strategy of Joining Strong Alliances.** The alliances with small countries can help to pursue their national interests in preserving their autonomy and self-government. The European Union or the ASEAN probably could be the best example of how a joint alliance of few countries can help each other. The benefits of joining such alliance are even greater for a young small country with less experience in self-governance. A small country can go further and join more than one alliance (if it is not a military neutral country of course) or other economic oriented alliances. This strategy requires commitment to certain values shared between the member countries of the alliance or even some concession over the traditional state power. However, this strategy seems to be one of the most attractive to many small countries and they are in a competition to become one of the members in a strong alliance.

c. **Seeking Protection from or Partnership with One Great Power Strategy.** The maintenance of the dignity of independence and the systemic lack of self-government skills may determine some country to seek protection of the former ruler or administrator. But being a satellite to a great power can cost more in long-run perspective where other countries can avoid any kind of economic, diplomatic etc relations with such a satellite just because of its relations with that great power. In the last two decades most of European small countries emerged as a result of collapse of Ex Soviet Union or Former Yugoslavia.

Factors to Develop Grand Strategy

There are many factors which might influence a small country to develop a Grand Strategy. Few options are highlighted below:

a. Because a grand strategy must be sufficiently ambiguous to allow for broad interpretation, when implemented, it must ultimately leave the nation more secure options.

b. At times, the task of the leaders and policy makers is even more difficult in formulating it. That is why sometimes the absence of a Grand Strategy is a strategy itself, especially for a small country.

c. From the geographical point of view it is more plausible that a small country with a great power neighbour will choose to be a satellite of that power. The same geographical location might determine a country to declare its neutrality. For some small countries, there is a conflict of such factors – e.g. where the proximity of great powers and the economic interests of joining an alliance conflict.

Options for Small Country

The absence of the commitments allows the country to be flexible and a small country may not be strong enough to keep commitment due to resource constraint. Again, becoming satellite to a great power binds the small countries to adapt the country security strategy according to the agenda of great powers and to seek for more forthcoming benefits. It pushes small countries to change the course of its decisions according to the changes of the international arena. Indeed, it can be concluded that small countries are different, and these differences make them act in different manner. These distinctive patterns derive from their geography, natural resources, political institutions, and proximities to great powers, demographics and historical precedence. Within the unique context of particular circumstances a nation decides whether to design its Grand Strategy or not. It is prudent to say that a small country needs a Grand Strategy just because it would help to avoid chaotic decisions and save its scarce resources. It is definitely more substantial than the assertion that a small country does not need such a strategy due to its lack of capacity and resources to implement it. It is the Grand Strategy that answers this very question: how to achieve its goal when it has few resources and low capacities? So, considering the realistic possibilities of a country and the possible outcome of all factors described above, there is a good chance to design a small Grand Strategy for a small country. Bangladesh, being the small state in size suffering from resource constraint, may not opt for developing absolute Grand Strategy. On the other hand, to achieve the national objective and in order to maintain steady development, Bangladesh should choose to develop a Grand Strategy of a size that can be persuaded through available resources.

Conclusion

A country endeavours to formulate its Grand Strategy to protect its national integrity and interests. Be small or big, all countries formulate and pursue their own strategy that depends on their influence in the region, neutrality, state of security, ability of employing resources and ability of joining alliances. However, it may appear provisionally that a small country should not indulge her resources for formulating and perusing her Grand Strategy. But considering the attributes it may be difficult for a country to establish her as a small country and at the same time pursue for a Grand Strategy formulation. By and large, all countries will need to formulate individual Grand Strategy and the size of Grand Strategy will depend on ability to direct its resources to pursue it. In this context, a small country should have a small size Grand Strategy.

BIBLIOGRAPHY

1. http:// en.wikipedia.org/wiki/grand_strategy.html date 20 May 2012

2. http://nationalsecuritypolicy.blogspot.com/2011/10/grand-strategy-for-small-countries.html date 19 May 12.

3. http://en.wikipedia.org.wiki/small_state.html date 18 May 12.

Gp Capt Md Shafiqul Alam, psc, GD (N) *was commissioned in Bangladesh Air Force in the GD(P) branch on 30 December 1985. He has served in different Command, Staff and Instructional appointments in BAF and other Inter Service organizations. At the Air Headquarters, he served as Director Welfare and Ceremony. He was Officer Commanding of Command and Staff Training Institute (CSTI) BAF. He served in the UN mission twice in DR Congo. Apart from all mandatory courses, Group Captain Shafiq has undergone a number of courses at home and abroad. He is a graduate of DSCSC, Mirpur and Royal Malaysian Armed Forces Staff College. Besides holding a diploma in Strategic Studies from University Malaya of Kuala Lumpur, he also obtained a master's Degree in Defence Studies from the National University. Presently, he is serving as Senior Instructor (SI) of Air Wing at Defence Services Command and Staff College.*

SHAPING JUNIOR LEADERS IN ARMED FORCES: A PRAGMATIC APPROACH

Lieutenant Colonel A K M Maksudul Haque, psc, Signals

Introduction

Bangladesh Armed Forces came into being through a triumphant War of Liberation in 1971, where the junior military leaders led the liberation forces from the front. Those valorous junior leaders orchestrated superb leadership qualities in the battle fields and brought home the glorious victory for the 'Nation'. They set the examples of leading small groups in the battlefield. Thereafter, forty years have past and we have developed our armed forces in many fields to the global standard keeping substantial scopes to improve upon in the field of junior leadership. This paper will propose a pragmatic approach to shape our newly commissioned officers into effective junior leaders in our Armed Forces.

Understanding Junior Leadership

Leadership. Military Leadership is the art of influencing and directing men to an assigned goal in such a way as to obtain their obedience, confidence, respect and loyal cooperation.

Junior Leadership. Junior leaders are basically the subunit or small unit commanders like company or battery, squadron etc. They are the officers at the rank of Lieutenants, Captains and young Majors. Therefore, junior leadership means leading a small unit or subunit by a young military officer in peace and war through commanding the soldiers' respect, loyalty, will and emotions remaining very close to them.

Role. In broad head, there are three categories of leaders in armed forces - Formation Commanders, Unit Commanders and Su-bunit Commanders. The Formation Commanders are the Generals who concentrate a winning combination of forces in the area of combat operation. The Unit Commanders are the Colonels who direct and control the Battalions in the battlefield. Finally, the Subunit Commanders deliver the combat power upon the enemy and ensure that solders fight with skill, will and team work in the close combat. Indeed, the junior leaders are the tools who act as the cutting edge in warfare. They lead the troops from the front in the battlefield through inspiring the solders either to defeat the enemy or die. They actually, execute the commanders' strategy and Commanding Officers' (CO) tactics on ground by fighting along with own troops shoulder to shoulder. Therefore, the chief roles of junior leaders are:

a. Preparing small units to fight the battle.
b. Leading small units during battle.

Contextualization. The young officers must inculcate the psyche of being one of the soldiers in the subunit. They should not feel shy to remain with the soldiers even while they are working in grass cutting or cleaning the line and unit areas. It is astonishing to observe that sometimes young officers as patrol leaders possess reservation to stand with the troops in a patrol post or travel in the same compartment with under-commands. Reasons for this prevailing gap may be the frequencies and volume of non-operational commitments, technological advancement, increase of getting higher education facilities, UN mission assignments, shift of socio-cultural environment, huge deputation assignments, escalation of financial abilities, tremendous development in ICT, globalization of armed

forces etc. Therefore, it is time to address the issue and build our junior officers as junior leaders.

A Pragmatic Approach

Leader is Made

"If History proves anything it proves that great leaders are not born but made." They became great leaders by knowing their job thoroughly and making themselves well educated in their profession. They combined their knowledge and professional skill with profound personal respect for their under-commands.

Leadership Training

Academic Lessons. The present education module at BMA and other training institutions are quite judicious. In the existing syllabi at BMA, the increased study on great captains within the framework of military history could be more effective. The case study method of learning is always interesting and fruitful. Through case study, the personalities, character traits, strong and weak points should be brought out to take inspiring lessons from the brilliant military leaders' biography. Personality study should start from our valorous military leaders of Liberation War. Then the famous military leaders of the early Islamic days and other modern military leaders of history should be studied closely. In this context the military life of the great Prophet Hazrat Muhammad (pbuh) would be most effective. A separate module may be worked out in this regard encompassing BMA training through mid-level officers' courses.

Institutional Training. To shape our junior officers as effective junior leaders, more emphasis should be put on the practical part of the leadership training. The institutional training here means a close interactive mixing with the troops for certain period; to inculcate leadership qualities in the junior officer through leading them on ground in various fields of unit affairs. Until and unless they develop confidence on their leader, troops may not give their lives with the leader's order. Therefore, the young officer must mix up with his starting from the morning PT till the light out at 2200 hrs at night. Thus, mutual understanding and confidence would develop. This would convince the under-commands about the superiority of their leader. The leader also will get the opportunities to exercise his knowledge on junior leadership so far acquired. On the other hand, the soldiers will admire him throughout the service career and never forget him when he becomes senior. This bondage, confidence and influence on those particular soldiers would last long, which could be a force multiplier in the battlefield. Keeping the above discussion in view, I shall now put in a four-tier pragmatic step for inducting Lieutenants in our Army as junior leaders.

a. **Regimentation.** Regimentation period for a newly commissioned officer should be increased up to six months, when he must not be detailed in an individual event where troops are not involved. These six months should be completely dedicated for staying, living, working, playing and being trained with the troops. He should be assigned to accomplish tactical and administrative tasks to lead his section, platoon or subunit guided by his supervisory officer.

b. **Recruits' Trainer.** After completion of initial regimentation, the junior leader should go to his own arms/service's training centre to impart General Military Training (GMT) to the recruits for 12 weeks, whom he would command throughout his career. This would yield far-reaching impacts and manifold dividends. The recruits' initial grooming up will be far better than present system. The young officer is also availing

an opportunity to practise his leadership. The recruits and associated JCO/NCO instructors would have the opportunities to observe the superiority of young officer to build confidence on him. Finally, the recruits would remember him throughout and develop mutual understanding and respect for their would-be leader.

c. **Interactive Training with NCOs.** After imparting GMT to the recruits, the young officer falls back to his unit and resumes the subunit leadership. After six months, he should be sent to the NCOs' Academy for interacting with the NCOs of all Arms and Services through a joint training package. There will be mass interactions amongst themselves which would increase the inter arms/services cooperation and understanding in various types of operational and non-operational activities in future.

d. **Training at Basic Courses.** All the training institutions should plan for outdoor and indoor exercises of Basic Courses with the ongoing JCO/ORs' courses jointly. There, the young officers would get the opportunities to interact and exchange views through working with the JCOs/ORs very closely.

Junior Leadership Training Cycle

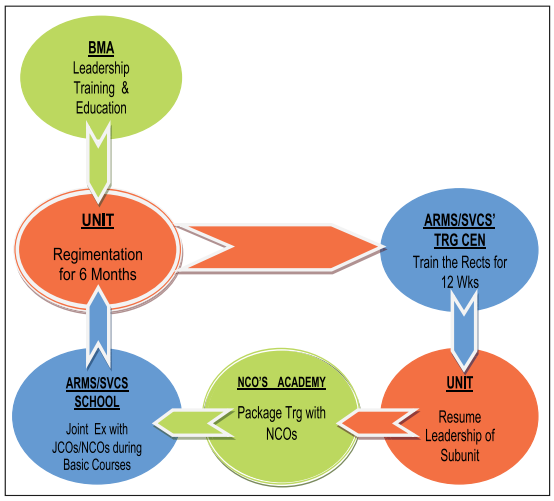

Preparing Thyself

Self Development. No programme will succeed, if the individual young officer himself is not keen to become an ideal leader. BMA, other Training Institutions and the Unit ensure an environment to learn and exercise leadership. But his personal interest, determination, positive professional approach and hard work only could make him leader. In that he has to:

a. Carry out personal study for self-education. Manuals, literature, military history, biography of successful military leaders etc should be studied vigorously.

b. Consult with available senior officers and learn from their experiences.

c. Discover own strong points and strengthen those further while eradicating the possessed weak points.

Attributes. To shape thyself up to an ideal leader the young officer should inscribe following core attributes in them:

a. **Courage.** Courage is taking risk in the battlefield, even may be the risk of total-loss. The action in the battlefield starts with courage and continues till the end. The leader generates courage which travels down to each individual soldier. It is the cumulative result of physical as well as moral courage. Physical courage is the courage in action which is visible. The moral courage exists only in mind and heart, which enables a leader to shoulder responsibility or blame of an act, and accept criticism.

b. **Will.** 'Will' enables a leader to take decisions and execute his plan successfully in the face of every challenge. 'will' has got two elements; boldness and tenacity. With 'boldness' the leader decides to

carry out a daring action while 'tenacity' enables him to hold out until the mission is accomplished.

c. **Intellect.** 'Intellect' is the power of thought as the first cause of effective action." It further attributes three other qualities; imagination, flexibility and judgment. 'Imagination' guides the leader to adopt innovative means to accomplish task in the field. 'Flexibility' is defined as the "ability to shift mental gears under pressure without confusion of purpose." And 'Judgment' is the ability of leader to consider a range of alternatives and possible effects of it before an action.

Flow Chart of Leadership Attributes

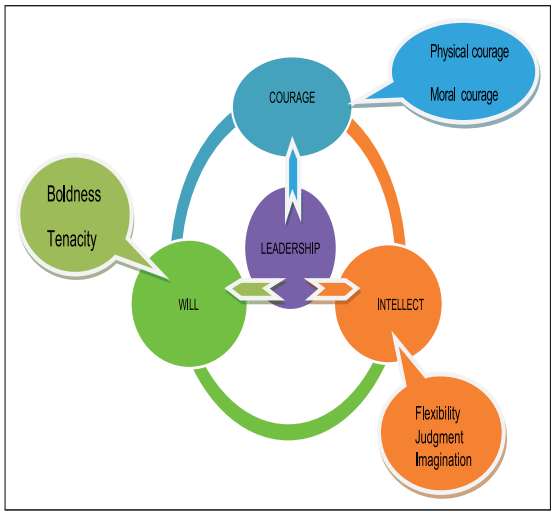

(Source of Concept: W. J. Wood, 1984)

Virtues. There are few virtues which needed to be embedded in the leader's personality which are imperative for leading the soldiers in the battlefield:

a. **Patience.** 'Patience' is the most remunerative essence of human quality. It lays the foundation for building leadership which renders perseverance, constancy, and self-restraint and refuses him to be cowed down in any situation. The Holy Quran ensured, "…if you persevere patiently, and guard against evil, then verily, that will be a determining factor in all affairs, that indeed is a matter of great Resolution".

b. **Justice.** The leaders must conduct all the affairs with justice. Any unfair dealing will arouse resentment and hatred among the affected soldiers. God has commanded, "O you who believe! Stand out firmly for justice, as witness to Allah, even though it be against yourselves…"

c. **Generosity.** "Leadership and generosity are very closely bound to each other". Compassion and kindness are the attributes of generosity. A generous leader automatically seizes love, respect and emotion of under-commands. The God had guided his Messenger (pbuh) as, "And by the Mercy of Allah, you dealt with them gently, And had you been severe and harsh-hearted, they would have broken away from about you."

d. **Religious Faith.** Norman Copeland argued, "That religion can play a large part in making of a leader no one can deny." But, one must keep in mind while becoming pious that extremism or fanaticism is contradictory to any religious belief. Copeland also said, "Other things being equal a religiously disposed officer is the better leader."

Leadership Technique

"A man of personality is one who is interested in his fellows, and the greater his interest the more successful he is likely to be as a leader." Therefore, the crux of leadership is the dealing with the led. The junior leaders therefore should practise the art and techniques described in subsequent paragraphs.

Leading from the Front. The leader has to administer his subunit well and instil dynamism in his soldiers. He should take

initiative to inspire them towards goal-achievement. For inspiring the soldiers God has ordained His Prophet (pbuh) as "and rouse the believers to fight." To lead from the front, a leader should:

a. Know his soldiers by name, their weaknesses, strong points, capabilities and limitations as well.

b. Take decisions and shoulder responsibilities. For taking decision, he should select the best course of action at his judgment; he may consult with the under-commands but should accept the responsibility at the end. He must not slide down the blame on to the led, if there is a failure.

c. Possess the ability to teach the led.

d. Give personal recognition to each of his men for the good job done. Because, praising someone is an effective way of motivation.

e. Criticise whenever a job is poorly accomplished; of course, discuss the job itself instead of blaming the doer himself.

f. Understand their problems and difficulties before delivering orders and instructions. Instructions must be clear, audible, affordable and not too many at a time. Instruct to definite person or team precisely.

g. Keep the men constantly in contact. They should not be kept isolated from command. Give patience hearing to their personal problems and try to solve through legal ways or at least advise them.

h. Avoid vanity or presenting the false front. Be straightforward and honest, be firm without being cruel and remain friendly without being familiar.

j. Keep them informed about new developments, situations and assignments. Brief them time to time.

k. Use the existing chain of command to disseminate orders and instructions, and dispose routine administrative affairs.

Ensuring High Morale. A good leader should always try to keep the soldiers' morale high. Hazrat Mohammad (pbuh) said, "Any man whom Allah has given the authority of ruling some people and he does not look after them in an honest manner, will never feel even the smell of paradise." The leader should ensure the following to maintain high morale of the under-commands:

a. Timely meal for them.

b. Cleanliness and hygiene of them, their accommodation and surrounding areas.

c. Necessary rest and sufficient sleep after being fatigued.

d. Regular communication with their families at home.

e. Recreation by watching TV, playing indoor games, reading newspapers, magazines and other books of interest.

f. Talk to soldier about himself, his family and unit affairs; to give him feelings that he is a counted man in the subunit.

g. Select the right man for task accomplishments.

h. Soldiers can practise their religious rituals appropriately. No religious faith should be criticized or undermined.

j. Individuals' documents related to account and training are updated regularly.

k. Family welfare through providing timely ration items, allotting houses in justified ways.

l. Systematic and timely medical care, judicious leaves and out passes.

Ensuring Discipline. The junior leader has to adopt the following steps to ensure a high standard of discipline in his subunit:

a. Every individual in the subunit should wear neat and clean uniform so that they look smart.

b. Their hear-cut, shaving - if not bearded - should be proper.

c. Saluting of each soldier must be of expected standard.

d. Disciplinary cases must be addressed immediately with justice. Overdose and under-action or no-action for indiscipline acts must be avoided. Rather they should be considered, whether it was an innocent mistake or an intentional breach of discipline.

e. Training for each individual should be ensured for preparing him for war and qualifying for the next higher rank.

f. Solders' complaints regarding food, accommodation, leave, health, family problems should be addressed immediately with due attention.

g. Rumor must be dealt with sincere attention at the beginning. The leader should immediately inform them the fact as regards to rumor and report the matter to the CO at once.

Team Building. The Holy Quran painted the picture of a team as "Truly Allah loves those who fight in His Cause (righteousness) in rows (ranks) as if they were a solid Cemented structure." The junior leader should tie all the members of his subunit in one-piece team. He should:

a. Identify himself as much as possible with his group. When his solders are undergoing hard training or carrying out fatigue in the field, he should not remain in his office away from them.

b. Visit the sick solders in hospitals regularly.

c. Get his subunit as one-piece and inspect their group drills once in a weak.

d. Seek for challenging tasks from CO and accomplish those by the subunit.

e. Brief them, move them, supervise them, feed them, criticise them and appreciate them as a team towards the task accomplishment.

f. Always use the team words like "we", "Our", "Us" instead of individual words "I", "Me" and "My".

g. Instil a sense of pride in each soldier about their group. Create a tempo in the group to be the best within the unit for achieving group enthusiasm.

h. Conduct conferences when necessary with under-commands to encompass all in the decisions taken. Their appropriate suggestions may also be considered and honoured, if suitable. God has taught His Apostle, "and consult them in affairs. Then when you have taken a decision, put your trust in Allah…"

j. Inspire and infuse the spirit of comradeship into the subordinates. Leader himself should set the example of comradeship first.

k. Praise the Platoon Commander for his platoon's good deeds, and admonish him for its poor performance as well. Declare personnel of high standard as exemplary for others to follow in the subunit. A senior soldier on the other hand, should not be humiliated for a wrong deed in front of his under-commands. He may be called away for necessary admonition.

Self-Control. The junior leader must keep the following instincts under control:

a. Tendency of misusing the authority or power.

b. Sadistic attitude.

c. Complex of inferiority as well as superiority.

d. Complex of fear and confusion.

e. Emotional outburst.

f. Nepotism and partisan or biased dealings.

g. Delivering impracticable orders and instructions.

h. Segregation of men by religion, cast, language and ethnicity.

j. Blaming the led for group's poor performance instead of shouldering it.

k. Ignoring the words committed to the men.

Conclusion

Our predecessors had orchestrated glorious junior leadership in the battles in the War of Liberation and left huge lessons for us. Following their footsteps we have to prepare our young officers so that they are able to lead their under-commands effectively in peace and war. The present system of shaping junior leaders should be revised. A comprehensive education module may be worked out starting from BMA through various training institutions subsequently. However, to shape our young officers as effective junior leaders, more emphasis should be put on the practical part of the leadership training. Besides the leadership education and training, the young officer himself must take personal interest to become an ideal junior leader. He should instil leadership attributes and virtues in thyself and follow the art and techniques enumerated above.

Lt Col A K M Maksudul Haque, psc *was commissioned in the Corps of Signals in 1988. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur. Besides serving in various Divisional Signal Battalions in staff and command appointments, he had been a Staff Officer at STC&S. He also commanded a Signals Detachment in OKP-1 at Kuwait, different Detachments of Army Security Unit and an Independent Brigade Signal Company. After commanding a Signal Battalion and two Regiments of Bangladesh National Cadet Corps, he is now serving as Chief Instructor at Signal Training Centre in STC&S.*

MARITIME DOMAIN : IMPERATIVES AND STRATEGY FOR BANGLADESH

Captain Mir Ershad Ali, (G), psc, BN

Introduction

Never before has the maritime domain of the country drawn such attention as it happened following the landmark verdict by the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in the dispute settlement of maritime boundary with Myanmar. Maritime stake holders have been longing for this to happen for ages and finally it has happened with a bang. Now the mass population of the country also realizes the vitality of the maritime domain and the enormous opportunity it presents to the prosperity and well being of the nation.

Since ancient days men have been sailing across the ocean in pursuit of trade and livelihood. During the last half century, the world has witnessed phenomenal growth in two areas, population and technology. The fast growing population has also given rise to overcrowding, poverty and depletion of land resources. On the other hand, innovation of technology and human knowledge of oceanographic science showed the ways of meeting the needs for the exploding population; that is to exploit the resources of the oceans, which cover about three-quarters of the earth's surface.

The sea plays a vital role in our national life. The maritime domain is the most promising way for Bangladesh to pursue its national interests. Our land resources cannot alone support our vast population, therefore we are bound to focus our attention to the sea. Economically and strategically Bangladesh remains a maritime nation, mostly dependent on what happens at the sea. However, giving the current global and regional security environment, and specially after the verdict of the ITLOS, a comprehensive maritime security strategy that includes entire gamut of maritime domain is required to maximize the benefit. Such strategy should promote a concerted effort among various actors and stakeholders including various maritime industry partners.

When we talk about maritime strategy, very often we think of navy and naval strategy. This is a much more myopic view which limits the intrinsic meaning of the term. Maritime strategy encompasses a much bigger and wider spectrum. Basically maritime strategy is about the use of sea. It is the national policy for the use of sea. It must affect or dominate every aspect of national, political, economic, diplomatic as well as military considerations.

In this paper an effort has been made to analyze the imperatives of maritime domain of Bangladesh in the changing context and conceptualize the strategy to maximize the benefit.

Maritime Domain Of Bangladesh– Changing Context

Strategic Changes in Global Perspective

For almost over forty years, the nations of the world based their national strategies and military thinking on cold war politics. But the world has changed a lot in the past few decades and no longer defined by the clash of ideologies and the potential for super power confrontation no more remains the overriding factor. The iron curtain has fallen and now the world has a greater potential for lasting peace than any other time in the recent history. But

peace, as always, can be elusive since the cold war has been replaced by a very complex set of challenges and uncertainties.

BIPOLAR WORLD	NEW WORLD ORDER
Bipolar rigidity	Multipolar complexity
Predictable	Uncertain
Communism	National/religious extremists
US dominant western power	US military # 1, not economically
Fixed alliances	Ad hoc coalitions
"good guys versus bad guys"	"grey guys"
Un paralyzed	Un viable

Table 1: *Global Changing Context*

This is particularly true in case of maritime strategy of the littoral states. The ever increasing globalization of economies, the growing concerns regarding the security of sea lanes of communication, the increased dependence on the seas for commercial trade and resources, and the need to protect offshore installations against threats during both peace and war are few of the challenges being faced by the littoral nations. Within this scenario, it is inevitable that the maritime concerns of Bangladesh will grow with the passage of time as well.

Geo-Political Perspective

In the wider perspective, the geo-political interests of Bangladesh include the maintenance of territorial integrity, the economic upliftment of her citizens and improvement of the quality of life in general. To do this, it is imperative that the short and long term aims of Bangladesh are concentrated on efforts to maintain peace and stability with her neighbours within the region and to ensure that the areas of influence around her are free from external interference and power projection.

The Law of the Sea (LOS) and Naval Proliferation

For centuries the vast expanse of the ocean was known to be the 'Common Heritage of Mankind' and was free to all users. The 3rd UN Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS-III) has opened new ocean regime giving rights over 12 nm territorial water and 200 nm Exclusive Economic Zone (EEZ) and a maximum of 350 nm of continental shelf. The adoption of EEZ rights brings rewards for the coastal states in terms of potential revenue, but it also brings responsibilities, in terms of policing and protecting the area.

Preservation and exploitation of such economic rights have been taken as a challenge by most littoral states and they have reviewed the role of their navies. Such a review has been necessitated with each state's desire to protect the unexplored reserve of wealth at sea and the seabed. Such desire has resulted in naval proliferation even amongst smaller states, where Bangladesh is no exception.

Implication of Recent ITLOS Verdict

The recent ITLOS verdict has tremendous implication to the nation. It has not only reaffirmed our rights over the exclusive economic zone and continental shelf, it has opened windows of opportunities for the exploration of resources. This will enable Bangladesh to take initiatives to maximize the use of most of the natural resources, like precious oil and gas in the sea and bring impetus to our trade and commerce. From the military point of view this verdict has marked the end of decades' old impasse over the maritime boundary dispute between the two countries, which had all the potentials to escalate from a low intensity maritime conflict to a full scale war.

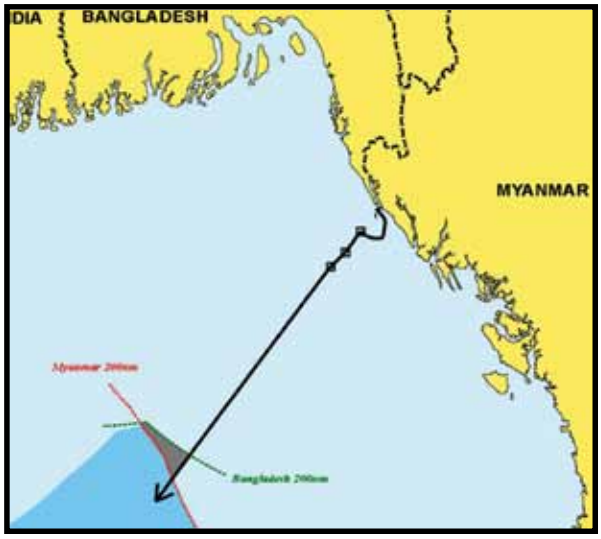

Fig-1: *Maritime Boundary and EEZ Demarcation Between Bangladesh and Myanmar*

Maritime Security Scenario

Maritime security is a multi-disciplinary concept that involves military science, police science, domestic and international laws, and geopolitics of the area concerned. The importance of maritime security cannot be overemphasized because it affects territorial integrity, human security and economic prosperity. The ambit of maritime security is very wide and covers many aspects. Besides national efforts, regional or global cooperation is necessary to ensure maritime security, in particular non-military threats. All the current and emerging nations demonstrate a clear awareness of the importance of maritime security in the 21st century. Threats emanating from the maritime domain affect all nations and require collective efforts to effectively counter them.

Maritime domain of Bangladesh has to be secured from military and non-military threats. However, our political trend, foreign policy since independence and present situation including economic and social condition indicate that our maritime threats are more non-military in nature than military. Even in peacetime, we need to ensure protection of SLOC including security of merchant ships against piracy in outer anchorage and in harbour. Poaching and marine pollution in our EEZ are continuous threats, requiring surveillance and protection. Also our fishing fleets are vulnerable to pirates. Moreover, smuggling, drug trafficking and gun running pose no less threat. Natural disaster and accidents at sea are other types of threats requiring search and rescue operations. Our offshore gas installations are also vulnerable against sabotage and attack by miscreants or terrorists.

Maritime Strategy For Bangladesh

Concept of Maritime Strategy

The concept of a transparent, clearly articulated and sustainable maritime strategy will play a major role in the continued support of Bangladesh's national interests, mainly in terms of her overall economy, trade relations, security and peaceful coexistence with her neighbours. Clearly, a nation's maritime strategy must support both its overall national military strategy and its defined national interests. Maritime strategy flows down from national interests through national security policy and is embedded in the overall national security strategy of the nation. On the other hand Naval Strategy is an important component of maritime strategy. Therefore, a viable maritime strategy correlates to the free use of the seas by a nation in order to gain or effect economic growth, scientific development, political stability and the defence of national growths. To do so, a nation's maritime strategy does not need to be provocative in order to be effective, should be rather responsive, sustainable and flexible.

Proposed Maritime Strategy of "Cooperative Engagement"

From the above conceptual framework it is obvious that our maritime strategy should not only resort to military option, rather must include political and economic options as well. In that perspective, the maritime strategy for Bangladesh should be a "Co-operative Engagement" which should encompass the dimensions and tenets in consonance with her stated national interests as shown in the table below:

Maritime Strategy of Bangladesh	
Dimensions	**Tenets**
Political	National Political Maritime Strategy
Economic	National Economic Maritime Strategy
Security	National Military Maritime Strategy

Table 2: *Dimensions and Tenets of Cooperative Engagement*

Dimensions. The 'Cooperative Engagement' maritime strategy for Bangladesh should include, but not be limited to, the following dimensions:

a. **Political.** In the political arena our maritime strategy should seek for stability, territorial integrity, pose credible deterrence to potential aggressor and ensure democratic way of life.

b. **Economic.** In the economic field, our maritime strategy should aim to promote trade and commerce, enhance maritime infrastructures like shipping, ports etc and importantly protect sea lanes of communications (SLOCs) and living and non living resources.

c. **Security.** Rendering security protection to all those who lives on sea borne activities should be also the concern for our maritime strategy. Moreover, enforcement of effective EEZ surveillance to eliminate illegal activities like smuggling, gun and drug running, terrorism to offshore structures, infringement of customs and immigration laws, etc should also be party to it.

Tenets. The 'Cooperative Engagement' maritime strategy for Bangladesh should include, but not be limited to, the following basic tenets:

a. **National Political Maritime Strategy.**

(1) Alliance-building with regional and ex-regional partners for securing common interests.

(2) Cooperative policy agreements with regional and ex-regional partners for the recognition of vital security interests.

b. **National Economic Maritime Strategy.**

(1) Exploitation and expansion of commercial shipping capabilities.

(2) Cooperative maritime shipping/ trade ventures with regional and ex-regional partners.

(3) Coordinated exploitation and development of the EEZ for the common interests of the region.

(4) Joint/combined ventures for expanded economic research, study and discovery.

(5) Joint/combined seabed development and mining.

c. **National Military Maritime Strategy.**

(1) Credible deterrence through active deployments and exercises.

(2) Joint/combined military exercises with regional and ex-regional partners as confidence building measures.

(3) Nation building activities, aid to civil power, assistance through humanitarian and/or relief operations.

(4) Counter-drug and counter-terrorism operations in the sea lines of communications.

(5) The use of appropriate naval force to deter aggression and protect interests.

(6) To fight and win the nation's war.

Bangladesh Navy – A Strategic Instrument

To support our overall maritime strategy, our navy must be suitably designed as an effective strategic instrument. Bangladesh Navy (BN) has witnessed phenomenal growth in last few decades. When she first set the sail she had only two gunboats. Today BN stands tall with more than 80 ships and craft. In the recent years BN has also opened two new vital dimensions namely SWADS and Naval Aviation. A number of important procurement projects are also on-going. Today, BN is not only pledged to safeguard territorial integrity, she has also expanded her commitment to peace beyond national frontier.

In the changing context, it is a necessity to have a Strategic Sail Plan for BN which will look beyond the horizon. The implementation of that plan will need consistency and commitment from all concerned with occasional fine tuning and necessary adjustment of set and drift.

Conclusion

The sea is all around us and has no frontier outside the national limit. It is a great international highway, which can be used not only to carry trade and people but also to project power and influence for either peaceful or hostile motives. Being a maritime nation, Bangladesh is highly dependent on sea though does not have a maritime strategy. Recent context of ITLOS verdict and other changes reiterate the necessity to formulate a suitable strategy, implying the approach of the nation to the vast expanse of the maritime domain. In this context, the blend of various maritime dimensions coupled with various tenets proposed herein as a potential maritime strategy of 'Cooperative Engagement' for Bangladesh has particular merit. This strategy will serve the interests of the nation most as it calls for the cooperation of all concerned and recognizes navy as a strategic instrument.

BIBLIOGRAPHY

1. Alam, M. K (Now Rear Admiral (retd) and Addl Secretary), Maritime Strategy for Bangladesh in the New Millennium.

2. Corbett, J. S , Some Principles of Maritime Strategy, (London:1971).

3. Haq, Md Ramjul, Exclusive Economic Zone in the Bay of Bengal, (Dhaka Bangladesh South Asia and the World, International Studies Association, 1972), P.171.

Captain Mir Ershad Ali, (G), psc, BN *was commissioned on 01 Jul 1989 in the Executive Branch of Bangladesh Navy. He has attended various courses at home and abroad. He did Naval Officers' Basic Course from Germany and Gunnery Specialization course from India. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur and also from the German Staff College. He has also obtained Masters in Defence Studies. Captain Ershad served in different capacities in Naval Headquarters, onboard various ships and establishments of Bangladesh Navy. He also served in Ivory Coast as UN Military Observer and as Directing Staff at DSCSC. Presently he is serving as the Commanding Officer of BNS BANGABANDHU.*

BANGLADESH NATIONAL AIR DEFENCE: AT NEW CROSSROADS

Group Captain Qazi Mazharul Karim, psc

Damage is the key to not losing- *The key to not losing is to inflict enough damage on the enemy that he becomes unable or unwilling to pay the price. Is this a truism that it doesn't need stating? While it may be truism, it is not easily put into action. One necessarily must think exactly what must be done to lead the enemy to give up his offence.*[1]

-Col John A Warden III

Introduction

The nation has stepped forward on new crossroads for National Air Defence (AD) through induction ceremony of first ever Surface to Air Missile (SAM) system in the inventory of Bangladesh Air Force (BAF) on 4th December 2011. The Chinese built FM-90 SAM system was successfully test fired in Bangladesh (BD) prior to induction.[2] FM-90 SAM system can be labelled as SHORAD (short range air defence) or extended SHORAD missile system. The inclusion of FM-90 SAM has altered the existing Ground Based Air Defence (GBAD) landscape or environment of BD. In essence, this induction has paved the way for a potent National AD through many such future acquisitions. These future acquisitions are likely to take place across all services; land, air and sea.[3]

In Bangladesh GBAD environment, employment of SHORAD and extended SHORAD for point defence by all services and fielded force, Medium and Long Range SAM by Air Force are very likely in near future. Besides, limited defensive depth allowing very less reaction time and retaliatory (act upon engaged) posture may also indicate necessity of limited Surface to Surface missile capability in future.

BAF FM-90 SAM System on the march

When induction of SAM system indicates improved AD effectiveness, it poses many other associated challenges also. In future, when all services are likely to employ missile system -planning for missile defence would be a necessity and undoubtedly it would be a joint mission. Hence, "Think Joint" would be the key word. It would also become imperative to learn to use the strength of one organization/service/system to balance out others weaknesses. Planning for effective employment of these SAM are likely to dictate AD organizational reform, setting up of sound and redundant C2 (command control) network, doctrinal change, etc. [4] Besides, as most SAM systems are state of art equipment associated with automated mechanical, electrical and electronic interface, human resource development for manning, maintaining and operating the newly acquired systems could be an issue.

In addition, issue of air space management, engagement procedure for all AD weapon system and above all, integration of various AD weapon for synergy would be of great concern. The backbone of any AD system is its detection capability through surveillance equipment. Understanding on selection of appropriate surveillance sensor or 'sensor fusion[5] would be a necessity for future AD Commanders and staff alike.

BN FM-90N SAM System

It is easily understood, shortcomings and limitations would not only hinder national AD capability but also likely to increase possibility of fratricide–blue on blue kill. Developing well groomed ECM and ECCM[6] capability, effective utilization of IFF across the services would be a challenge. The scenario would be even more complex when Bangladesh Navy (BN) and Bangladesh Army (BA) would acquire more aerial platforms.

In true sense, BD national AD is at a new crossroad today. Because, now things can go either way- wrong or right. To be effective and efficient -the future AD planning would need to rise above inter-service rivalry, fight over control of air assets, force rank structure, service dominance, command structure etc and set operational necessity as the prime factor.

BA QW-2 MANPAD

This article would attempt to discuss future possibilities in BD GBAD environment and identify a few key concerns where specific attention would be necessary while formulating a comprehensive national AD plan. By no means, it is exhaustive and primarily focused on GBAD aspects. Nevertheless, it will offer points to ponder for military planners. The discussion will evolve around required characteristics of short range SAM, principles for SAM operation and Challenges ahead to build an apt AD system with inclusion of SAM.

AD System Characteristics [7]

In a broad perspective following are required characteristics for any short range ground based AD system; these are the primary considerations during planning for new acquisition:

a. All weather capability.

b. Good performance against physically small and low-observable targets.

c. Good performance against low altitude targets.

d. Good performance against fast crossing targets.

e. Capability against non-line-of-sight (NLOS) helicopters.

f. Maintenance of performance in a countermeasure environment.

g. Provision of simultaneous channels of fire from single equipment.

h. Minimum vulnerability to defence suppression and asset fingerprinting.

j. Capability to operate with C3I[8] integration and autonomously.

Most of the features discussed above are quite common with various current AD missile systems including FM-90 SAM. But, the future AD system would demand increased capability in all aspect. PJ Hutchings and NJ Street of Air Space Management System Department, Defence Evaluation and Research Agency, UK identified the following requirements for future ground based AD system[9] :

a. Forecast threat would require a significant increase in lethality compared to current system.

b. Capability against air-launched missile would be essential.

c. Engagement ranges, against agile and fast moving targets, greater than 7-8km would be desirable to minimize the regime where neither threat launch platform nor threat munitions can be engaged.

d. Most demanding target detection requirements would be set by those targets which operate at very low altitude, by missile with high, terminal dive angles, and by the fast LO (low observable) missile targets.

e. Capability to provide multiple, simultaneous fire channels from a single equipment to provide resistance to saturation attack from stand-off missile.

f. Non line of sight (NLOS) capability to engage attack helicopters.

g. Ability to operate sensors and launchers remotely from each other; which can enhance system performance specially against small cross section targets at very low altitude, and offer other benefits of operational security, survivability and flexibility.

SAM Employment Principles

Besides inbuilt attributes of a weapon system, employment principles greatly contribute on success. It is essential to develop clear understanding on these principles for effective employment of SAM. The principles that come into play for effective SAM employment are; mass, mix, mobility, and integration. When applying these principles commanders and planners at all levels must consider the tactical and technical capabilities of individual weapon system.

In simple terms mass is to concentrate combat power. At times it may be essential to accept certain level of risk in specific area to attain mass in specific area. The principle `Mix` indicate employment of a combination of weapon system. As described earlier, weakness of one system may be compensated by effective mix of weapon system. A good mix is likely to dictate enemy aircraft to adjust their tactics. Manoeuvres designed to defeat one system may make an aircraft vulnerable to another weapon system- that is the wonder of good mix. Planning for such mix requires finest understanding of all system that is under consideration for deployment. An effective mix also demands sound C2 structure supported by network capability.

SAM mobility is the capability to move from one location to another while retaining the ability for operation or engagement. SAMs ability to move must be equivalent to its support elements. At times it may become as a logistic impossibility. It must also be noted

BAF FM-90 SAM

that mobility is survivability for SAM units. The term or principle integration means close coordination of effort and unity of action that maximizes operational effectiveness. This integration is necessary for system itself, planning, and overall concept of operation.

Challenges Ahead

On a first hand scenario BD is likely to face many challenges to adopt the new AD weapon system like SAM. It is already finding it difficult to effectively integrate existing aerial and AD assets of three services. National AD plan is in constant review to keep pace with modernization and strategic objective. In essence, inclusion of SAM in ADGE (Air Defence Ground Environment) could alter the way we are used to think on AD plan. Few key areas that need immediate attention are discussed below:

a. **Organizational Setup.** The inclusion of SAM system may necessitate new approach to our services organizational set up. Present set up of wing, flight, squadron and trade and branch distribution of BAF may or may not be suitable for effective employment of SAM. Similarly, AD Brigades set up of BA (Bangladesh Army) or its command chain may not be suitable for integrated AD net or BN (Bangladesh Navy) set up of ship, squadron, flotilla and base set up may or may not offer an ideal situation to integrate SAM system in BD GBAD environment. A collective and comprehensive approach would be necessary among all services including paramilitary and civil defence for preparation of a National AD plan to include the SAM system besides many other weapon systems/platforms. If we fail to create a righteous organizational structure- we are likely pay the price through fratricide; having blue on blue kill.

b. **Logistic Support.** SAM units are expected to be highly mobile and independent unit. They are also likely to be operated/deployed in remote locations. Supporting these elements with adequate services and support like fuel, food and water, power supply, tent or camp facility, etc would be quite challenging. BAF experience of last few months during deployment has given us a long list of equipment and accessories for adequate support. Supporting four fighting vehicle would demand few six ton truck, pick up van, water trailer, fuel truck, generator, portable or mobile kitchen, portable latrines, refer van etc. Any limitation in the logistic chain may hinder mobility and thus reduce survivability.

c. **Training for Operation and Maintenance.** The modern SAM systems are state of art equipments. Its operation and maintenance demands specialization. These systems demand a minimum basic knowledge for technicians and operators due to dominance of electronic equipments on board these missile launching and surveillance vehicles. Our technicians of all services may find it difficult to cope with the demand of these systems especially

when third line maintenance is in question. At times, due to high level of automation these systems may give a false impression of simplicity. And thus, BAF and BN being relatively more technical oriented service may suffer from complacency- that we already have adequate knowledge base for smooth adaptation of the system. On the other hand BA may suffer from lack of required knowledge for technicians. In reality, effective and efficient employment of these new weapon systems can only be ensured through proper equipping and manning with appropriate level of knowledge.

d. **Integration.** Integration of different SAM system between services and designing for Layered AD could pose as `the biggest` challenge. It may demand initial acquisition of similar type SAM system across the services, network set up for data transfer capability, establishing SAM command hub etc. Joint planning and joint training would be a key element. The design for integration would require validation through various Joint Service Air Defence Exercises. To make room for all/various type of AD weapon system of three services, we may require new approach to exercise designing[10].

e. **SAM Deployment Philosophy.** To have an effective integration and utilization of SAM there would be need for a deployment philosophy. Deployment philosophy should be in consort with SAM principles of mass, mix, mobility and integration to offer max effectiveness of SAM system.

f. **Developing Employment Strategy.** Understanding across the board as planner and executioner is essential for developing an effective employment strategy. Introducing SAM in BD ADGE is new, but presence of SAM in ADGE is not new. Many wars have been fought using SAM and its knowledge is available in the print and electronic format. Many of us have gained different level of experience on SAM during training or visit abroad or through personal study. But most importantly, one needs to develop clear understanding on capability of procured system and limitation and strength of existing BD AD before embarking on devising or designing SAM employment strategy for BD. Even understanding on selection and pattern of deployment of an individual SAM unit can be daunting[11]. The obvious questions would emerge- is conventional layered AD approach with conventional FEZ (Fighter engagement zone), MEZ (missile engagement zone, GDA (Gun defended area) etc are a solution? Do we require MSAM (medium range SAM)- if so, how soon it is expected? How to de-conflict FEZ and MEZ within a small airspace like BD? How to operate with superimposed FEZ and MEZ without fratricide? What freedom of operation would be enjoyed by BA or BN SAMs? As an honest confession- we need to ask, do we need help of advanced counties to set up an integrated automated AD command control centre?

g. **Developing Doctrine for Joint Warfare.** Our joint warfare doctrine is still in its infancy. Now inclusion of SAM in ADGE is a must. Air Defence Operation Centre (ADOC) as the command hub of national AD commander (Chief of Air Staff) is required to be equipped and manned for its purpose. To be effective, required manning must be in peace, in

tension period and in war alike. All possible scope of dual command control must be eliminated.[12] We need to ask ourselves, can we efficiently and effectively operate and fight with given organizational set up? Is inclusion of SAM making the management more challenging? Does organizational set up with conventional ACOC (Air Command Operation Centre), ADOC or SOC (Sector Operation Centre) offers our ADGE weapon system adequate flexibility and reaction time or we need to shift towards modern thinking of creation of SITUATION ROOM.[13] Creation of such facility relies on advanced networking and data transfer capability. As such, emphasis on EW is a must in our future/ revised doctrine and we do not have any other option but to embark on network centric command control structure.

h. **EMCON[14] Policy.** Nothing would be effective in the arena of AD if we fail to come up with a smart and prudent EMCON policy. Survival of SAM system also would largely depend on an efficient EMCON policy. Establishing an EMCON policy to allow adequate freedom of operation and at the same time maintain required secrecy would always be a challenge.

Conclusion

It is true; we are on a 'hurdle race'- many obstacles and hurdles will have to be negotiated for a seamless non-porous layered national AD. Definitely SAM inclusion in ADGE has taken us a step ahead to make national AD a formidable one. Surveillance radar, AD frigate, fighter interceptors, various type of SAM from three services, AAA guns offers us with an effective AD umbrella.

In future, our national AD system is poised for a fierce capability with new acquisitions like few more surveillance radar for BAF, few more units of SAM and MSAM for BAF, BN and BA, additional squadron of AD fighter and maritime fighter aircraft or MRCA[15], advance radar control AAA and automated operation centres (ACOC, ADOC, SOC, SAM command hub) etc. Our strategic defensive approach and limited offensive capability dictates to have the very best for defence. When capability of retaliation is intended, minimizing loss through active and passive measures must be well groomed. In such situation, nothing is more asked for-than a comprehensive and integrated AD capability supported by adequate networking infrastructure for real time data transfer. In essence, joint planning and integrating in all aspect and operation oriented command control and communication setup is the necessity of time. Truly, our national AD is at the crossroads today–making the right decision to negotiate various challenges is the important factor. Let's hope we make the right choices at the crossroad and make our future national AD our dream air safety net.

Notes and References

[1] Col John A. Warden III, The Air Campaign, Planning for Combat, United States National Defence University Press Publication, 1988.

[2] Chinese specialist and BAF personnel conducted successful test firing of FM-90 SAM on 24 October 2011 near BAF Base Cox's Bazar.

[3] BN is in possession of AD SAM (maritime version of FM-90 SAM) on board ship and MANPAD (Man portable AD system) since 2010. BA is in possession of Chinese built MANPAD since 1992 (HN-5 and QW-2 Vanguard-2, 1992 and 2006 respectively) .

[4] BD armed forces have drafted a joint doctrine in May 2006.

[5] Use a mix of active and passive sensor.

[6] ECM-Electronic Counter Measure, ECCM-Electronic Counter Measure.

[7] Future Short Range Ground-based Air Defence: System Drivers, Characteristics and Architecture, PJ Hutchings and NJ Street.

[8] C3I-Command Control Communication and Information.

[9] Paper titled 'Future Short Range Ground-based Air Defence: System Drivers, Characteristics and Architecture' presented at the RTO SCI Symposium on "System Concept for Integrated Air Defence of Multinational Mobile Crisis Reaction forces", held in Valencia, Spain, 22-24 May 2000, and published in RTO MP-063.

[10] Dividing BD into almost equal half for playing adversaries may not be a suitable option with integration of SAM. The dimension of FEZ and capability of MEZ are likely to dictate new dimension of exercise map/boundary.

[11] Experience of recent Air Defence Exercise, BAF ADEX 2012-1.

[12] AD organization chart of BD as Annex A to Chapter 13 of Draft Joint Warfare Doctrine has such indications. During engagement, role of AD commander, ADA Brigade Commander and Maritime commander may be in conflict.

[13] Command hub for all commanders, linked with all possible network to give real time information to facilitate decision making.

[14] EMCON-emission control.

[15] MSAM- medium range SAM; MRCA-multi role combat aircraft.

BIBLIOGRAPHY

1. Col John A. Warden, `The Air Campaign –Planning for Combat`, National Defence University Press Publication, 1988.

2. Kenneth P. Werrell, 'Archie to SAM, A Short Operational History of Ground –Based Air Defense`, Air University Press, August 2005.

3. Colonel Dale C. Eikmeier, `Organizing for Success: Theatre Missile Defence in Korea', Air & space Journal, January 2001.

4. Air Commodore (Retd) Jamal Hussain, Ownership of Air power Assets, Air power Journal, 2001.

5. PJ Hutchings and NJ Street, `Future Short range Ground-based Air Defence: System Drivers, Characteristics and Architectures`, Published in RTO MP-063.

Group Captain Qazi Mazharul Karim, psc *was commissioned in BAF on 29 December 1987 in the GD(P) Branch. During his career, he held various command, staff and instructional appointments. He also attended various courses at home and abroad. He is an operational fighter pilot with Air Defence speciality. He is a graduate of Defence Services Command and Staff College, Mirpur and Air Command and Staff College, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA. He was closely involved during induction of newly acquired Surface to Air Missile (SAM) system for BAF. Presently, he is serving as Officer Commanding, Flying Wing, BAF Base Zahurul Haque.*

DESIGN AND DEVELOPMENT OF SUBMARINE : SUITABLE OPTIONS FOR BANGLADESH NAVY

Commander Khandakar Akhter Hossain, (E), psc, BN

Introduction

The idea of travelling underneath the ocean waters inside a closed vessel has been around for centuries. Some history says, Alexander the Great ventured below the waters of the Aegean Sea inside a glass barrel around 333 B.C. The next record of a submarine came more than 1900 years later. In 1578 AD British naval officer William Bourne described a wooden frame vessel enclosed in waterproof leather; which was rowed underwater. C Drebbel, a Dutchman patented his submarine, which was bound by waterproof leather, invented in 1598, was powered by oars allowing it to be rowed underwater and air was provided by tubes. His boat was successfully tested in the Thames River and travelled at depths about 5 meters. In 1904, the French built the Aigrette, the first submarine to use a gas engine on the surface and an electric engine below. The US followed in 1911 with the F-class Skipjack submarine. It was powered by diesel instead of gas engines. During First World War (WWI), Germans and their U-boats proved the worth of the submarine in the war theater. Germany was successful in submarine operation for the sinking of 11 million gross tons of Allied ships. In 1938, Auguste Piccard built his record-setting bathyscaphe Trieste. This 50-foot-long submarine still holds the record for deepest dive, about 12,000 meters deep in the south Pacific's Marianas Trench.

Technology of Submarine

Submarines are completely enclosed vessels with cylindrical shapes, narrowed ends and usually two hulls. The inner or pressure hull protects the crew from the immense water pressure of the ocean depths and insulates the vessel from the freezing temperature. The outer hull shapes the submarine's body. The ballast tanks, which control the submarine's buoyancy, are located between the inner and outer hulls. Modern nuclear and electric submarines are of single hull. Stability and other submarine's buoyancy are controlled by ballast tanks. Submarine's size & position are calculated by precision design technology. To stay in control and stability, a submerged submarine must maintain a condition known as trim. It means submarine's weight must be perfectly balanced throughout the whole body. Two trim tanks forward and aft help the submarine keep the accurate trim by either added or expelled water from them as needed.

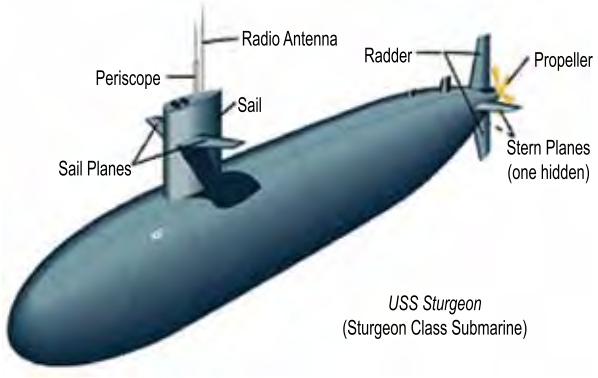

Once the submarine is underwater, it has two controls mechanism used for steering. The rudder controls side-to-side turning, or yaw. On the other hand diving planes, control the submarine's rise and descent, or pitch. There are two sets of diving planes. The sail planes and the stern planes. Some modern submarines, like Virginia class of US Navy (the latest nuclear submarines), make use of bow planes

rather than sail planes. In the above figure of a submarine, it has a tall sail that rises out of the submarine's hull. Inside this fin-shaped sail is the conning tower ("conn" means to direct the steering of a vessel). The periscope, radio and radar antennas are usually extended through the conning tower. In the early days, submarine was operated from conning tower. A periscope enables a submarine to see what is happening on the surface while remaining underwater. With the advances in technology, the entire look and operation of submarines change. In Virginia-class submarine, a series of mirrors and lens are used to view above the surface where colour cameras send visual images to large screen displayed in the ship's control room.

Working Principles of Submarine

To function underwater, submarines are built a bit differently than surface ships that float on water. In order to travel underwater, submarines must function in agreement with some key laws of nature, including Archimedes' Principle and Boyles' Law. Whether a submarine is floating or submerging; depends on the ship's buoyancy. Buoyancy of submarine is controlled by the ballast tanks which are found between the submarine's inner and outer hulls or some special arrangement of ballast tanks. A submarine resting on the surface has positive buoyancy. It means it is less dense than the water around it and subsequently will float. At that time, the ballast tanks are mainly full of air. To submerge the submarine, it must have negative buoyancy. Vents on top of the ballast tanks are opened. Sea water coming in through the flood ports forces air out the vents, and the submarine begins to sink. To make the submarine rise again, compressed air is simply blown into the tanks forcing the seawater out. To keep the submarine upright, her metacentric height remains positive.

History of Submarine Development

Initially, submarines depended on human's energy to move. Submarine designed by Drebbel was tested on the Thames River in 1620 and carried the King of England on one of its dives. It used oars to move itself along. In the mid-1770s, David Bushnell built a submarine Turtle that used hand and foot cranks for propulsion. This one-person submarine was the first used in war and exhausted its operator within a few minutes. Robert Fulton developed a three-person submarine Nautilus, in the early 1800s. It was the first to use diving planes to control depth. While submerged, it relied on a hand crank to move it along. For travel on the surface, the Nautilus was equipped with a sail. Fulton then tried to build a more efficient submarine using steam. But, due to the large and bulky size of the boiler, he failed. In the 1860s, the Confederates built steam-powered submarines and were never completely submerged. The first submarine in the US Navy, the USS Holland, used a gasoline engine while on the surface and an electric engine while submerged. The electric engine could recharge while the gasoline engine was being used. The electric engine allowed the submarine to travel underwater for a few hours, at a decent speed. The engine was relatively small, but the batteries were large, bulky and heavy. Finally, steam and gasoline engines were phased out by less-volatile diesel engines. In 1904, the French became the first to build a submarine Aigrette, which used a diesel engine on surface and an electric engine while underwater. The US followed the trend building its first diesel-powered submarine, the F-class Skipjack, in 1911.

In the 1950s, nuclear power partially replaced diesel-electric propulsion. Equipment was also developed to extract oxygen from sea water. These two innovations gave submarines

the ability to remain submerged for weeks or months, and enabled impossible voyages such as USS Nautilus' crossing of the North pole beneath the Arctic ice cap in 1958. Most of the naval submarines built since 1960s in the US and the USSR/Russia have been powered by nuclear reactors. The limiting factors in submerged endurance for these submarines are logistic supply and crew morale. In 1959, the first ballistic missile submarines were put into service by both super powers as part of the Cold War nuclear deterrent strategy.

Use of Submarine

Submarines were first widely used during World War I (1914–1918). Now-a-days, Military usage includes attacking enemy surface ships or submarines, aircraft carrier protection, blockade running, ballistic missile submarines as part of a nuclear strike force, reconnaissance, conventional land attack (by using a cruise missile), and covert insertion of special forces. Commercial/ civil uses for submarines include marine science, salvage, exploration and facility inspection/maintenance etc. Submarines can also be modified to perform more specialized functions such as search-and-rescue missions or undersea cable repair. Submarines are also used in tourism and for undersea archaeology.

Hull and Construction

Modern submarines are cigar-shaped, sometimes called a "teardrop hull". It reduces the hydrodynamic drag when submerged; but decreases the sea-keeping capabilities and increases drag while surfaced. Since the limitations of the propulsion systems of early submarines, their hull designs were compromised. Late in WWII, when technology allowed faster and longer submerged operation, hull designs became teardrop shape to reduce drag and noise. Today, in a modern military submarine, the outer hull is covered with a layer of sound-absorbing rubber, or anechoic plating, to improve stealth capacity. Usually the pressure hulls of deep diving submarines are spherical instead of cylindrical. This allows a more even distribution of stress over the hull at the great depth. All post WWII; Soviet/Russian heavy submarines are built with a double hull structure. American and most other Western submarines switched to a single-hull approach. They still have light hull sections in the bow and stern, which house main ballast tanks and provide a hydro-dynamically optimized shape. But the main cylindrical hull section has only a single plating layer. The double hulls are being considered for future submarines in the US to improve payload capacity, stealth and range. Picture shown below is the nuclear submarine USS Greeneville in dry dock.

The submarine hull usually known as pressure hull is generally constructed of thick high strength steel with a complex structure. WWI submarines had hulls of carbon steel, with a 100-metre maximum depth. During WWII, high-strength alloyed steel was introduced, allowing 200-metre depths. High-strength alloy steel remains the primary material for submarines today. To exceed that limit, a few submarines were built with titanium hulls. Titanium can be stronger than steel, lighter, and is not ferromagnetic. Titanium alloys allow a major increase in depth and a Russian Alfa-class submarine successfully operated at 1,300 meters. However, the high cost of titanium construction led to the abandonment of titanium submarine construction as the Cold War ended.

Power and Propulsion

First submarines were human propelled. The first mechanically driven submarine was French Plongeur in 1863,that used

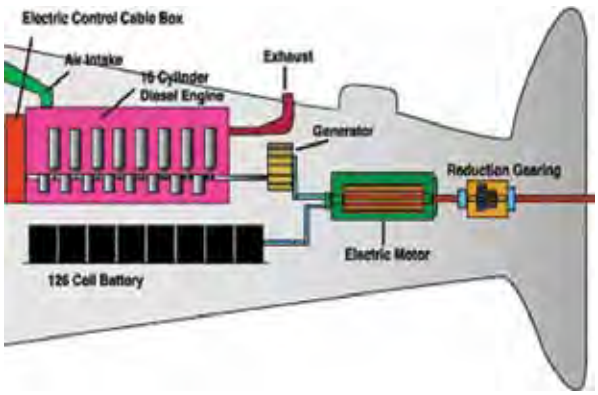

compressed air for propulsion. Anaerobic propulsion was first employed by the Spanish Ictineo II in 1864,that used a solution of zinc, manganese dioxide, and potassium chlorate to generate heat and oxygen. Most 20th century submarines used batteries for running underwater and petrol or diesel engines on the surface. Finally diesel-electric became the standard means of propulsion. The clutch between the motor and the engine would be disengaged when the submarine dived. The motor could have multiple armatures on the shaft, which could be electrically coupled in series for slow speed and in parallel for high speed. During the WW II, German Type XXI submarines were designed to carry hydrogen peroxide for long-term, fast air-independent propulsion (AIP). Today several navies use AIP. Notably Sweden uses Stirling technology, where engine is heated by burning diesel fuel with liquid oxygen from cryogenic tanks. British Vanguard class submarine uses pump-jet propulsion instead of propellers.

Weapons and Armament

The success of submarine is directly linked to the development of the torpedo, invented by Robert Whitehead in 1866. His invention is essentially the same now as it was 140 years ago. To increase combat endurance most WWI submarines functioned as submersible gunboats, using their deck guns against unarmed targets. With the arrival of ASW aircraft, guns became more for defense than attack. The ability of submarines to approach enemy harburs covertly led to their use as minelayers. Modern submarine-laid mines are designed to be deployed by a submarine's torpedo tubes. After WWII, both the US and the USSR experimented submarine that launched cruise missiles and anti-ship missiles such as Exocet and Harpoon. Ballistic missiles can also be fired from a submarine's torpedo tubes, such as Tomahawk. Germany is working on the short-range IDAS (missile) which is launched from a torpedo tube and can be used against ASW helicopters as well as surface ships and coastal targets.

Sensors and Communication

A submarine will have a variety of sensors determined by its missions. Modern military submarines rely almost entirely on a suite of passive and active sonar to find their enemy.

Active sonar relies on an audible "ping" to generate echoes to reveal objects around the submarine. Passive sonar is a set of sensitive hydrophones set into the hull or trailed in a towed array, generally several hundred feet long. Hull mounted sonar is employed to back up the towed array, and in confined waters. Submarines also carry radar equipment for detection of surface ships and aircraft. Commercial submarines rely on small active sonar sets and viewing ports to navigate. Military submarines have several systems for communicating with distant command centres or other ships, such as; VLF (Very Low Frequency) radio for shallow depth and ELF (Extremely Low Frequency) for greater depths. To communicate with other submarines a sonar telephone is used.

Crew and Navigation

Typical nuclear submarines have 80 to 120 crew. Non-nuclear or diesel-electric or AIP submarine typically have 20 to 30 crews. The conditions on a submarine can be difficult because crew members must work in isolation for long periods of time without family contact. Submarines normally maintain radio silence to avoid detection. Operating a submarine is dangerous, even in peacetime and many submarines have been lost in accidents. Submarine crew need dedication, strong will power and good team work. Staying, eating, sleeping and all other day to day activities by the crew in a submarine are highly organized and systematic. Unnecessary movement and making noise by the crew of a submarine is highly restricted. Early submarines had a few navigation aids. But modern submarines have a variety of navigation equipment. Modern military submarines use an inertial guidance system for navigation while submerged, but drift error unavoidably builds up over time. To counter this, the Global Positioning System is occasionally used to obtain an accurate position. The periscope allowing a view to the surface is only used occasionally in modern submarines. The most modern submarines have photonics masts rather than hull-penetrating optical periscopes. These masts must still be hoisted above the surface, and employ electronic sensors for visible light, infrared, laser range-finding, and electromagnetic surveillance. The most benefit to hoisting the mast above the surface is that while the mast is above the water, the entire submarine is still below the water and is much harder to detect visually or by radar or by ASW helicopter.

System and Support

With nuclear power, submarines can remain submerged for months at a time. Diesel submarines must periodically resurface or snorkel to recharge their batteries. The most modern military submarines generate breathing oxygen by electrolysis of water. Fresh water is produced by either an evaporator or a reverse osmosis unit. The primary use for fresh water is to provide feed water for the reactor and steam propulsion plants. It is also available for showers, sinks, cooking and cleaning purpose. Seawater is used to flush toilets, and the resulting "black water" is stored in a sanitary tank until it is blown overboard by using a special sanitary pump. Water from showers and sinks is stored separately in "grey water" tanks, which are pumped overboard by using the drain pump.

Conclusion

Submarines have one of the largest ranges of capabilities in any vessel, ranging from small autonomous (one- or two-person) vessels operating for a few hours, to vessels which can remain submerged for 6 months such as the Russian Typhoon class (the biggest submarines ever built in history). A conventional submarine operating on batteries is almost completely silent, leaving only the

noise from crew activity. AIP submarines, conventional diesel-electric submarines with some kind of auxiliary air-independent electricity generator become more popular as military arsenal. Commercial submarines usually rely only on batteries. Diesel-electric submarines have a stealth advantage over their nuclear counterparts. Some nuclear submarines such as the American Ohio class can operate with their reactor coolant pumps secured, making them quieter than electric submarine. Escape suits can be used by the crew to abandon the submarine while in accident. Submarine is a costly affairs and its operation is extremely challenging and courageous. But military submarine is the worthy naval asset to deter any potential enemy with any capacity.

Submarine for Bangladesh and Some Recommendations

A concealed military submarine is a real threat and can force an enemy navy to waste resources searching large areas of ocean and protecting ships against attack. This advantage was vividly demonstrated in Falklands War in 1982; when the British Royal Navy nuclear-powered submarine HMS Conqueror sank the Argentine cruiser General Belgrano. After the sinking, the Argentine Navy recognized that they had no effective defense against submarine attack, and the Argentine surface fleet withdrew to port for the remainder of the war. So, submarines are able to deter any fleet and are the strategic warship in modern warfare. As we are the legal owner of vast sea area in Bay of Bengal, so we hope that, Bangladesh will be the owner of a squadron of submarines in near future. Writer wants to share some experience with the readers from his limited practical observation and discussion with field maintainer and underwater expertise of Pear Harbor Naval Shipyard, Hawaii. Before taking a strategic decision to acquisition of submarine, Bangladesh Navy may consider some technical point/matter as described below:

a. All modern submarines are single hull. It needs less maintenance.

b. Submarine can not operate without completing some regular maintenance.

c. Submarine hull is quite thick and sensitive matter. Submarine hull welding need special temperature and arrangement; which is totally different from conventional welding.

d. Submarine need to be docked in dry dock. Floating dock or conventional slipway is neither safe nor recommended for docking any submarine.

e. Modern small submarine are diesel and battery operated. Mono hull German diesel submarine is the best and the most modern small type submarine. It needs less maintenance.

f. At least four in number submarines in a squadron is essential for usual operation of submarine in any water.

g. Submarine hull becomes very delicate and almost unusable after 30 to 35 years of submarine life.

h. Submarine recovery system and equipment is very costly matter.

j. Submarine hull, pipe and valve material, welding and maintenance need special skill and obviously is a costly affair.

k. Effective and long term training for a group of crew, dockyard staff and officers from submarine manufacturer is essential to operate and maintain submarine by any navy. Submarine maintainer and dockyard staff need some standard level of skill for maintenance of submarines.

l. Five separate submarine related Directorates (such as Submarine Operation, Planning, R&D, Maintenance and Equipment Management) and two bases (Operation and Dry Dock) are essential.

m. When submarine dives and remain under water; the life of crew is quite uncomfortable as compared to surface vessel. So it needs strong mental courage, dedication, self motivation and real team spirit.

BIBLIOGRAPHY

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine
2. http://marinebio.org/oceans/submarines
3. Hide and seek: the untold story of Cold War espionage at sea, by Peter Huchthausen and Alexandre Sheldon-Duplaix.
4. Redford, Duncan. The Submarine: A Cultural History from the Great War to Nuclear Combat.
5. Submarineheritage.com. http: // www.submarineheritage.com /history.html.
6. Humble, Richard (1981). Underwater warfare. Chartwell Books.
7. Roger Chickering, Stig Förster, Bernd Greiner, German Historical Institute. "A world at total war: global conflict and the politics of destruction, 1937-1945". Cambridge University Press.
8. William J. Broad (March 18, 2008). "Queenfish: A Cold War Tale". New York Times.
9. http://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/hangor.htm.
10. Roy Burcher, Louis Rydill. Concepts in Submarine Design. Cambridge University Press.

Commander Khandakar Akhter Hossain, (E), psc, BN *was commissioned in Engineering Branch on 01 January 1991. He did his BSc and MSc Engineering in Naval Architecture from Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET). He did MESC & ISMC from Pakistan and USA respectively. He is a Mirpurian and did MDS from National University and MBA from Open University. He served as engineer officer onboard different ships and crafts such as LPC, OPV & three Frigates (including modern missile Frigate BNS BANGABANDHU) and as instructor in Bangladesh Naval Academy, Marine Academy and Navy Engineering School. He also served as DGM (Shipbuilding) in Khulna Shipyard and as Staff Officer in UN Mission in Sudan. He also worked in Naval Headquarters as Deputy Director in Naval Engineering Directorate. At present, he is serving as GM (Production) in Dockyard & Engineering Works Ltd, Narayangonj.*

CAPACITY BUILDING ACTIVITIES OF BANGLADESH CONTINGENTS IN LIBERIA

Major Md Moksed Ali, AEC

Introduction

When Liberia was in a dire need of peace after fourteen years of long civil war, the Bangladeshi Contingents were amongst the first group of UN peacekeepers deployed in war-torn Liberia in October 2003. During the tour of duties, Bangladeshi peacekeepers have successfully met all the challenges that came on the way to restoring and ensuring peace and stability. The efforts taken by all Bangladeshi contingents are appreciated by the international community and the people of Liberia. Disarmament was the challenge to UNMIL and BANSEC succeeded in disarming the ex-combatants within its assigned area up to the full satisfaction of international community. "Win the hearts and minds of the people" having this slogan as spirit of work, the contingents of Bangladesh have been carrying out notable different Civil Military Coordination (CIMIC) activities since their deployment in Liberia which have helped the capacity building process in Liberian society. The CIMIC activities include vocational training, agricultural farming, free medical treatment, engineering assistance etc. These honest and sincere efforts have not only earned the good names for the Bangladeshi Peacekeepers under UNMIL but also helped the Liberian society substantially and generated hope amongst the distressed Liberian Youths.

UNMIL Civil Military Coordination (CIMIC) Mission

Throughout implementation over watch and drawdown, UNMIL Forces conducted CIMIC in coordination with UNMIL civil component, UN agencies and NGOs and Government of Liberia in order to exploit gains in security and stability, mitigate/reduce associated risks of drawdown/realignment, help build civil capacity and confidence and further shape conditions for achievement of the UNMIL mandate.

Objectives of The CIMIC Projects

Besides assisting in maintaining security and peace with the highest success rates, Bangladesh battalions have contributed in capacity building of the people of Liberia by implementing various projects. The main objectives of these projects were:

a. To build the capacity or/train less privileged Liberian citizen/people to become useful citizens.

b. To assist in developing human resource skills with a view to bringing about employment opportunities.

c. To allow the females of the community to train and develop themselves so that they can equally contribute to the national development like their male counterparts.

d. To prevent the people of the community, especially the young men, from involving into criminal activities by inspiring them into self-employment activities.

Achievement in Capacity Building

Bangladesh Sector since its deployment have carried out significant CIMIC activities which have been praised by all and also contributed in developing community life in Liberia. There were total thirteen agricultural projects that have been launched under Bangladesh Contingents in Liberia. Out of

them, five have already been handed over to the beneficiaries and other projects were in progress. The descriptions of the completed projects are as under:

a. **SIRLEAF Agricultural Project.** Self Integrated Rational Living Experimental Agro Farm **(SIRLEAF)** was established in 2007 in an area of 15 acres of abandoned piece of land that aimed at assisting local farmers as part of the capacity building process. The project was named after the name of Her Excellency Madam Ellen Johnson Sirleaf, the President of the Republic of Liberia. This project was implemented by BANBATT-12 at BUCANNON area under GRAND BASSA County. The project intended to assist farmers in the multiplication of seeds as most of the farmers did not have the supply of good seeds. This farm got wide publicity in Liberia. Now this project has been handed over to the local farmers who were involved with this project.

b. **GBEDIN Agro Project.** Agriculture is one the most effective tools for achieving the socio-economic development of Liberia. During the war, the basic infrastructures of most of the Agriculture projects were damaged. This project involved a damaged and unworkable agro farm in GANTA area under NIMBA County. BANBATT-13 made an endeavour to rehabilitate the project in the year 2000 involving a good number of local farmers. They established a rehabilitation committee and provided them a tractor, agro equipment, varieties of Bangladeshi hybrid seeds and herbicides. About 2500 local inhabitants were benefited out of this project. The local farmers were highly encouraged and inspired by its success. This project was also handed over to its beneficiaries.

c. **BANGLA-BONG Agro Farm.** The project was launched by BANBATT-11 with an area of 25 acres of land near GBANGA city towards the end of 2007. The entire concept of the project was to create a sense of ownership and belongingness to the war affected individuals. Total 400 ex- combatants and their families were directly involved in this project. Initially only 4 acres of the land was cleared for its cultivation. BANBATT-16 assisted the beneficiaries to expand the farm up to 25 acres. This project has got permanent shape by the patronization of BANBATT-16. At present rice, cassava, various types of vegetables are being cultivated in the project area. The ex-combatants got a new beacon of life in this farm. It inspired the other locals that farming can be one of the ways for self sustenance. The ex- combatants and their families who are directly involved in this farm are away from different anti-social activities. Mark Dowee, the head of the Bangla-Bong Agro Farm, could not hide his feelings at the departure of BANBATT-16 whom he termed his “very good friends”. “With the departure of BANBATT-16, we don’t think we’ll ever get any contingent that can replace them. They rendered us immeasurable assistance and imparted to us skills that have

redirected our orientation of life. They did extremely well for us," Dowee noted. With the assistance of UNDP, Government of Liberia, the Project committee has begun establishing similar model farms in other districts across the county. After the repatriation of BANBATT-16, this project was handed over to the Civil Authority.

d. **Youth for Development and Progressive Action (YDPA).** Youth for Development and progress (YDPA) is volunteer organization in Bong County of Liberia. It was started as a pilot project in June 2009 with 100 youth members. It is a mixture of war affected youths, students, abused girls and a few amputees. After the successful launching, it was proposed to expand through out 12 districts of the county. The aim of this project was to assist the youth of Bong County by enhancing knowledge on agricultural & vocational sector and assist to develop the economy and self sustainment. This project put some efforts to prevent the youth from committing criminal activities and involved them into something more productive and sustainable. It also demonstrated efficient agricultural development to the locals. The then Force Commander Lt Gen A T M Zahirul Alam, rcds, ndc, psc (retd) inaugurated this project formally on 21 July 2009. At present 50 acres of land have been brought under cultivation where rice, Cassava, different kinds of fruits and vegetables like Papaya, Cucumber, Beans, Okra, Corn, Brinjal, Water Melon, Potato etc were cultivated. Prince Simpson, the head of the YDPA group, recently reported a bumper rice harvest from 50-acres farm. He said they had harvested 1200 kilogram of rice. As the UNMIL is in draw down phase, this project has been handed over to civil authority and Project Committee.

e. **Ideal Village Project at SALALA.** BANBATT-14 launched an Ideal Village named as 'SHADOW OF HEAVEN' to rehabilitate war affected people of Salala/ Totato District in January in an area of 150 acres of land. This was the second major capacity building initiative of BANBATT14 in its Area of Responsibility. The then Force Commander Lt Gen A T M Zahirul Alam, rcds, ndc, psc (retd) inaugurated the BANGLA BONG IDEAL VILLAGE. The main focus of this village was to make awareness among the inhabitant that how well they can ensure their socio-economic security by utilizing their inter-dependency with each other. There are numbers of small towns around the county which are mainly along the road sides. This project comprise a school, community-based farms, a fish pond, vegetable gardening and 5000 fingerlings, and a poultry farm with chickens, ducks and goats, is actually a demonstration on how local villagers can produce all its own food and be self sufficient in addition to encouraging backyard gardening.

Vocational Training Centre

There were some vocational training centres established by Bangladesh contingents who are designed to train Liberian citizens, particularly the youths of Liberia in developing their human skill for building their capacity for creating employment and/or self-employment opportunities. These are:

a. **Bangladesh-Liberia Friendship Centre (BLFC).** BLFC is a vocational training centre established by Bangladesh Sector at GANTA City in 2005. Courses on five categories are running there. Those are Basic Computer, Tailoring, First Aid, Generator Maintenance, Electric Wiring and Fitting and Carpentry. More than two thousand local youths were imparted skill training in BLFC so far. This institution has been handed over to the local civil authority. But still this is supervised by Bangladesh Contingent (presently BANBATT-18).

b. **Bangladesh-Liberia Youth Centre (BLYC).** Bangladesh-Liberia Youth Centre (BLYC) was established in January 2008 at Bangladesh Square in CARI Compound. Vocational training on four categories is run in this institution. These are Basic Computer, Tailoring and Embroidery, Masonry, First Aid and Medicare. By now about 400 (four hundred) local youths have been trained there.

c. **Bangla-Nimba Capacity Building Centre (BNCBC).** A Vocational Training Centre named Bangla- Nimba Capacity Building Centre (BNCBC) was established by BANBATT-18 at Tappita. On 24 Jul 2010 the activity of BNCBC was inaugurated by the H'ble President of Liberia during her Independence Day visit. BNCBC is a joint collaborative CIMIC project, which will mainly be owned and run by the public, assisted by the GoL, UNMIL and UNDP. County / District administration will perform the supervisory roles in facilitating the smooth functioning of the institution, and ensuring its continuation even after UNMIL leaves. First session of BNCBC, Tapita has already been completed where total 44 local youths successfully qualified in three disciplines; namely Computer training, Tailoring and Generator repair & maintenance. Also the ground breaking ceremony of Bangla-Nimba Capacity Building Centre (BNCBC) at Sanniquellie was held on 27 July 2010. The foundation of BNCBC is laid by the DSRSG (ROL). In continuation with the capacity building programs in the counties, this vocational training centre was designed by BANBATT-18.

Ongoing Capacity Building Activities

"Be self-dependent and help yourself" is the idea, which drives the Bangladesh contingents towards skill training program aiming at fighting unemployment. Presently Bangladesh contingents are deployed under Sector-B consisting of 1431 Bangladeshi troops assisted by some Pakistani and Chinese as well.

Bangladesh contingents carried out different capacity building activities, which contributed significantly to the development of this community. People from all walks of life embraced Bangladeshi peacekeepers as their true friends, well wishers and real contributors. As the UNMIL is in drawdown stage, only one major Bangladesh Battalion (BANBATT-18) is deployed in Liberia. Most of the capacity building projects are now looked after by this battalion:

a. **Bain Clan Development Council (BCDC) Project.** To develop the capacity of income generating activities of rural people through agriculture farming the BCDC project was launched by BANBTT-17 in 2009. The project is mainly focused on cultivating paddy and vegetables. The aim is to encourage local community members to become self-reliant through similar projects and create bondage between contingents members and local citizens. Presently total cultivable area of the project is 15 acres and about 400 Liberians are directly benefited from it.

b. **Ideal Domah Town Project(IDTP).** With a view to building the capacity and confidence amongst the inhabitants through developing an ideal town consists of agriculture farm, poultry, fisheries, elementary school, playground and health sanitation system, the Ideal Domah Town Project (IDTP) was undertaken in 2009. It is basically a community development project which aims at assisting the inhabitants of Domah Town. This project was designed to transform a poorly organized community into a self-dependent, income generating, healthy and confident work force. Total inhabitants of this town are around 350.

c. **BANENGR CARI Agro Friendship Project (BCAFP).** Bangladesh contingent started a joint venture with Central Agriculture Research Institute (CARI) of Liberia to collaborate the easy techniques regarding production of harvest. BANENGR conceived an idea to bring the varieties in agro products by using various types of seeds taken from Bangladesh through the experts of CARI complex and using their farmers. Initially, the pilot project started with three acres of land within CARI complex. WFP extended its support for the payments of farmers. CARI experts are providing their manpower and equipment. Total 50 farmers of 15 family have been trained to improve their farmland in correct manner to make them self-sufficient. Moreover, new varieties of crops brought from Bangladesh are oriented with the Liberians.

d. **Other Agriculture Projects.** Following are some other agriculture projects run by the Bangladesh contingent in Liberia:

Ser	Name of Projects	Total Area
1.	Dordelah Swamp Project (DSP)	04 acres
2.	Karyen Swamp Project (KSP)	03 acres
3.	Douplay Swamp Rice Project (DSRP)	10 acres
4.	Old Loguatuo Zuoplay Rice Project (OLZRP)	05 acres
5.	Leagbala Swamp Agricultural Project (LSAP)	04 acres
6.	Rural Women Promoter for Sustainable Development Agricultural Project	04 acres

e. **Capacity Building of Liberian National Police (LNP).** Bangladesh contingent regularly assists local LNPs in improving their capability through on the job training. As a result, LNPs are now capable of checking vehicles at Snap vehicle Check points; provide security to the Central Bank of Liberia during transaction along with shipment and transit independently.

Conclusion

With the passage of time, UNMIL has got maturity and now it is in the drawdown phase. Peace in Liberia is also quite sustained and flawless. Accordingly, UNMIL has also re-evaluated its CIMIC focus in which maximum stress has also been given on the strength of capacity building as the UN mission gradually closes down. Keeping UNMIL CIMIC focus in view, Bangladesh contingents have also set their courses of action. But whatever role played by the peacekeepers, the main players here are the local population who found their needs and ways to take effective initiatives. The Bangladeshi peacekeepers will leave Liberia in near future physically but they will remain alive in the hearts and minds of the people through their sincere and relentless effort especially in the field of capacity building activities.

BIBLIOGRAPHY

1. BANSEC Review - 2006, Bangladesh contingent, Sector-3, UNMIL.
2. BANSEC Mirror - 2007, Bangladesh contingent, Sector-3, UNMIL.
3. BANSEC Mirror - 2008, Bangladesh contingent, Sector-3, UNMIL.
4. UN UNMIL Focus, Mar - May - 2010.
5. UNMIL Today , April - Sep 2010.

Major Md Moksed Ali, *was commissioned with 13 BMA Special Course in 1999 in Army Education Corps. He served as Instructor in Bangladesh Military Academy and Centre & School of Military Police, Education and Administration (CSMEA). He also served as Grade III staff in 14 Independent Engineer Brigade and Grade II in Education Directorate, Army Headquarters. He did his B.Sc (Hons) in Physics from Jahangirnagar University and M.Sc from Aligarh Muslim University, India in the same discipline. He obtained Doctor of Philosophy (PhD) degree from Jahangirnagar University in Nuclear Physics. Presently he is serving as Instructor Class-B in Bangladesh Infantry Regimental Centre.*

আলোকচিত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

ফিরে দেখা

১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারি বিএমএ এর প্রথম পাসিং আউট প্যারেড পরিদর্শন করছেন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট বিএমটিএফ হস্তান্তর শেষে মোনাজাত করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বানৌজা ঈসা খান এ স্বাধীনতাযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২০০১ সালের ২০ জুন বানৌজা বঙ্গবন্ধুর কমিশনিং কেক কাটছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। সাথে রয়েছেন বানৌজা বঙ্গবন্ধুর তৎকালীন অধিনায়ক ক্যাপ্টেন জহির উদ্দিন আহমেদ (বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান)

বিমান বাহিনী কর্তৃক আয়োজিত কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বিমান বাহিনী একাডেমির শীতকালীন গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে
ফ্লাইং ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১১ উপলক্ষে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০১২ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে
মহামান্য রাষ্ট্রপতি

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে অফিস কার্যক্রম সম্পন্ন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১১ উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একজন মুক্তিযোদ্ধার মায়ের সাথে কুশল বিনিময় করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সশস্ত্র বাহিনী আয়োজিত ইফতার-২০১২ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সমরাস্ত্র প্রদর্শনী-২০১২ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রদত্ত ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর উপর ব্রিফিং শুনছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০১২ এর 'পিসকিপার্স রান' উদ্বোধন করছেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১১ উপলক্ষে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বাহিনীত্রয় প্রধানগণ

যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব নেভি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সাথে মত বিনিময় করছেন

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ পরিদর্শনকালে US PACIFIC কমান্ডারের সাথে পিএসও এএফডি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

'ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ এন্ড এক্সচেঞ্জ-২০১২' এর সমাপনী দিনের একটি দৃশ্য

সেনাবাহিনী

পিজিআর এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সেনাবাহিনী প্রধান

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস-২০১২ উপলক্ষে বিআইসিসি ভবনে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্টল পরিদর্শনকালে মিশন এলাকায় অবস্থানরত সেনাসদস্যদের সাথে আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে কুশল বিনিময় করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

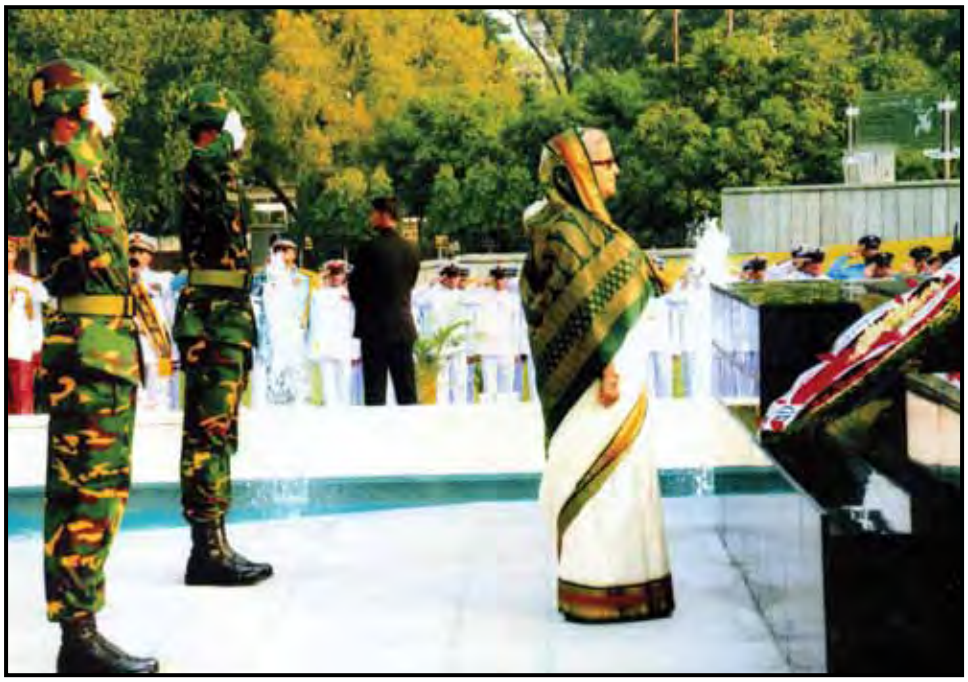

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১১ উপলক্ষে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নবনিযুক্ত সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সেনাসদর নির্বাচনী পর্ষদ-২০১২ এর উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পিজিআর এর ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শহীদ পরিবারের সদস্যদের অনুদান প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমরাস্ত্র প্রদর্শনী-২০১২ এর সেনাবাহিনীর একটি স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পিজিআর এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সেনাসদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সেনাসদর কর্তৃক আয়োজিত শান্তিরক্ষী সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় মত বিনিময় করছেন

নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন এর নিকট হতে দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন

প্রাক্তন সেনাপ্রধানকে আনুষ্ঠানিক রেওয়াজের মাধ্যমে বিদায় জানাচ্ছেন সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ

বাংলাদেশে সফররত ভারতীয় সেনাপ্রধানের সাথে ক্রেস্ট বিনিময় করছেন
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান

নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১২ উপলক্ষে সেনাকুঞ্জ মাঠে বৃক্ষরোপণ করছেন

বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করছেন সেনাবাহিনী প্রধান

যশোর সেনানিবাসে সিএসডি এক্সক্লুসিভ শপ উদ্বোধন করেন সেনাবাহিনী প্রধান

সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় চিকিৎসাধীন একজন রোগীর সাথে কুশলাদি বিনিময় করছেন সেনাবাহিনী প্রধান

সেনাবাহিনী প্রধান ২০১২ এর ১৫ জুলাই 'সিএসডি পোল্ট্রি ফার্ম ও প্রসেসিং প্ল্যান্ট' উদ্বোধন করছেন

সেনাবাহিনী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সিজিএস

মিলিটারি প্রভোষ্টদের সাথে এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মত বিনিময় করছেন

গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ-২০১২ চলাকালীন অনুশীলন এলাকায় রাইজিং টাইগার্স এর একজন সৈনিকের দুপুরের খাবার পরখ করছেন জিওসি, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন

প্রশিক্ষণ এলাকায় সৈনিকদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করছেন জিওসি, ১৯ পদাতিক ডিভিশন

আর্টিলারি সেন্টার ও স্কুল কর্তৃক তৈরিকৃত প্রশিক্ষণ ড্রোন উড্ডয়ন শেষে ড্রোন পরিদর্শন করছেন কর্নেল কমান্ড্যান্ট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর, এনডিসি, পিএসসি

বিআইআরসি'র বার্ষিক উপযুক্ততা পরিদর্শন-২০১২ উপলক্ষে প্যারেড পরিদর্শনকালে সৈনিকদের টার্ন আউট পরিদর্শন করছেন জিওসি, আর্টডক

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে Multipurpose Training Complex এর FIBUA Village এ প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করছেন প্রাক্তন জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন

১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড এর ব্রিগেড কমান্ডার IT-2 (OCU) এর ব্যবহারিক ক্লাস পরিদর্শন করছেন

ইএমই সেন্টার এন্ড স্কুলে প্রশিক্ষণ গাড়ি পরিদর্শন করছেন ইএমই পরিদপ্তরের পরিচালক

চিকিৎসা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, চট্টগ্রামের একজন রোগীর সাথে কুশলাদি বিনিময় করছেন

সেনাবাহিনী বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা-২০১২ এ চ্যাম্পিয়ন বগুড়া অঞ্চলকে ট্রফি প্রদান করছেন জিওসি, ১১ পদাতিক ডিভিশন

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ পর্ব-২০১২ এ চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি প্রদান করছেন কমান্ড্যান্ট, বিএমএ

৮২ মিঃ মিঃ মর্টার ফায়ার করছেন ২৯ বীরের সেনাসদস্যগণ

শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণ ২০১১-২০১২ এ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নের সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পন্টুন ব্রিজের উপর দিয়ে সেনাবাহিনীর একটি কনভয় অতিক্রম করছে

বীর রেজিমেন্ট এর ২৪ তম ব্যাচের রিক্রুটগণ শপথ গ্রহণ করছেন

অসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ এর ভাঙ্গন রোধে সিসি ব্লক ডাম্পিং করছেন ১৯ পদাতিক ডিভিশনের সেনাসদস্যগণ

থাই এয়ার ফোর্সের দুর্ঘটনাকবলিত বিমান উদ্ধারকার্যে সহযোগিতা করছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ

জাতীয় টিকা দিবস-২০১২ উপলক্ষে একটি শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়াচ্ছেন সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একজন মহিলা ডাক্তার

শীতকালীন প্রশিক্ষণ ২০১১-১২ এ শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ২৯ বীরের সদস্যগণ

মিরপুর-এয়ারপোর্ট সংযোগ সড়কে ফ্লাইওভার তৈরির কাজ করছেন ১৬ ইসিবি'র সৈনিকবৃন্দ

রাঙামাটিতে সম্প্রীতি উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার

চট্টগ্রামে পাহাড় ধ্বসে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার অভিযানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণ

লাইবেরিয়ায় শান্তিরক্ষী মিশনে একটি অপারেশনে অংশগ্রহণরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ

Exercise Shanti Doot-3 এর FTX এ বিদেশি কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুশীলনের একটি দৃশ্য

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পরিচালিত স্কুল 'প্রয়াস' এর ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত জার্নালের উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার পত্নী বেগম শাহিন সিদ্দিক। পাশে রয়েছেন 'প্রয়াস' এর পৃষ্ঠপোষক বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন

সেনাপরিবার কল্যাণ সমিতি পরিদর্শন করছেন সেনাপরিবার কল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষক বেগম তাহমিনা ইয়াসমিন

নৌবাহিনী

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২০ জুন ২০১২ এ বানৌজা হাজী মহসীনকে ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড প্রদান করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

বিজয় দিবস কুচকাওয়াজ-২০১১ এ নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পাসিং আউট ক্লাস এ/২০১০ ব্যাচের শ্রেষ্ঠ মিডশিপম্যানকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২০১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর নেভাল এভিয়েশন এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টার পাইলটদের সাথে কুশল বিনিময় করছেন

২০১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে বানৌজা নির্ভীক এর কমিশনিং ফরমান গ্রহণ করছেন ঘাঁটির অধিনায়ক

সমরাস্ত্র প্রদর্শনী-২০১২ এ নৌবাহিনীর স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামের ডাংগারচরে নেভাল কমান্ডো ঘাঁটি বানৌজা নির্ভীক উদ্বোধন শেষে বৃক্ষরোপণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নতুন সংযোজিত সি-৭০৪ মিসাইল উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি

খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নবনির্মিত প্রথম যুদ্ধ জাহাজ লঞ্চিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক
নৌসদর দপ্তরে Solar Power Plant উদ্বোধন করছেন

উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী ও খাবার পানি বিতরণ করছেন
নৌবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধান কর্তৃক 'বিএন কলেজ ঢাকা' এবং 'নেভি এ্যাংকরেজ ঢাকা' এর জন্য স্কুল বাস হস্তান্তরের একটি দৃশ্য

নৌবাহিনী প্রধান বিদায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীনকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন

লেঃ কমান্ডার শহীদ মোয়াজ্জেমের স্বাধীনতা পদক-২০১২ (মরণোত্তর) প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁর সহধর্মিণীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করছেন নৌবাহিনী প্রধান

খিলক্ষেত নেভি এ্যাংকরেজ ঢাকার উদ্বোধন করছেন নৌবাহিনী প্রধান এবং সভানেত্রী বানৌপকস

নৌবাহিনী স্কুল চট্টগ্রামে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট প্রদান করছেন
সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল)

এক্সারসাইজ CARAT-2012 উদ্বোধন শেষে কেক কাটছেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান
(অপারেশন্স) ও US Navy 7th Fleet কমান্ডার ভাইস এডমিরাল Scott JT Swift

নৌসদর দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত 'ইতিহাস কথা বলে সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা' অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আলোকচিত্র অবলোকন করছেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল)

CARAT অনুশীলনে US Navy ও বাংলাদেশের SWADS কমান্ডো একত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নবসংযোজিত মেরিটাইম হেলিকপ্টার প্রথমবারের মতো জাহাজের ডেকে অবতরণ করছে

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন লেবানন (UNIFIL) এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ওসমান বিদেশী যুদ্ধ জাহাজের সাথে যৌথ টহলরত

US NAVY 7th Fleet Commander এর পত্নী Mrs Trish Smith কে ক্রেস্ট হস্তান্তর করছেন সভানেত্রী BNFWA বেগম শবনম আহমেদ

সভানেত্রী BNFWA এর নিকট প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে পরিচালিত 'আশার আলো' স্কুলের জন্য বাসের চাবি হস্তান্তর করছেন ঢাকা ব্যাংকের প্রতিনিধি

বিমান বাহিনী

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের সাথে নবনিযুক্ত বিমান বাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২০১২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাশারকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে নবনিযুক্ত বিমান বাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র অন্তর্ভুক্তির কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টারের মডেল প্রত্যক্ষ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বিএএফ শাহীন কলেজ শমশেরনগর উদ্বোধন করছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ, এমপি

বিমান বাহিনী একাডেমির শীতকালীন গ্র্যাজুয়েশন কুচকাওয়াজ-২০১১ এর
প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) তারিক আহমেদ সিদ্দিক
সেরা চৌকস ফ্লাইট ক্যাডেটকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন

৩৯তম রিক্রুটদলের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে সেরা প্রশিক্ষণার্থী রিক্রুটকে ট্রফি
প্রদান করছেন প্রতিরক্ষা সচিব জনাব খন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান

দায়িত্বভার গ্রহণের পর শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন নবনিযুক্ত
বিমান বাহিনী প্রধান

নবনিযুক্ত সেনাপ্রধানের সাথে বিমান বাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বিমান বাহিনী একাডেমির গ্রীষ্মকালীন গ্র্যাজুয়েশন কুচকাওয়াজ-২০১২ এর সেরা চৌকস ফ্লাইট ক্যাডেটকে 'সোর্ড অব অনার' প্রদান করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

রাশিয়ার বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে কুশল বিনিময় করছেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান

১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাশিয়ায় আয়োজিত এয়ার শো প্রত্যক্ষ করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

৪৪তম ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টরস্ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে সেরা প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাকে
'মফিজ ট্রফি' প্রদান করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

বিএএফ শাহীন কলেজ ঢাকার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন বিমান বাহিনী প্রধান

কঙ্গো প্রজাতন্ত্র পরিদর্শনকালে বারাকা একাডেমিতে এতিম শিশুদের মাঝে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করছেন সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিচালন ও প্রশিক্ষণ)

আন্তঘাঁটি ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১২ এ বিজয়ী জহুর ঘাঁটি দলের প্রতিযোগীদের মাঝে সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (প্রশাসন)

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুর এর প্রতিনিধিদল বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলায় স্ট্যাটিক ডিসপ্লে পরিদর্শন করছেন

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের একটি দুর্গম এলাকায় জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সৈন্য মোতায়েনের একটি দৃশ্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সি-১৩০ পরিবহন বিমানে সৈন্য আরোহনের একটি দৃশ্য

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর যৌথ এক্সারসাইজ
'কোপ সাউথ-২০১২' এ অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর
মহিলা কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতা

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী বেগম মেরী ইনাম বিদায়ী সভানেত্রী বেগম শামীমা জিয়াকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

শিশুদের সাথে কেক কাটছেন বাফওয়া, মহিলা কল্যাণ সমিতি ও চিলড্রেন ক্লাবের সভানেত্রী বেগম মেরী ইনাম

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এ "Security and Natural Disasters: Bangladesh Perspective" এর উপর আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড.হাছান মাহমুদ, এমপি

বিইউপি'র ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

বিইউপি'র চাইনিজ ও বার্মিজ ভাষা শিক্ষা কোর্সের সনদপত্র বিতরণ সভার প্রধান অতিথি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী

বিইউপি'র ৪র্থ প্রতিষ্ঠা দিবসে শিক্ষার্থীবৃন্দ স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) এর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি-২০১১ এ ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স মেম্বারগণকে সনদপত্র প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি-২০১১ এর গ্রুপ ছবিতে সকলের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

অভ্যন্তরীণ শিক্ষা সফরে মুজিবনগর পরিদর্শন করছেন এএফডব্লিউসি কোর্সের ফ্যাকাল্টি ও কোর্স মেম্বারগণ

এনডিসি পরিদর্শন কালে কমান্ড্যান্টের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি এ্যাসিসটেন্ট ডিফেন্স সেক্রেটারি এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বারগণ

স্টাফ কলেজ

জর্ডানের জাতীয় দিবসে জর্ডানের অফিসারবৃন্দের সাথে কেক কাটছেন কমান্ড্যান্ট, ডিএসসিএসসি

ডিএসসিএসসি'র সেনাবাহিনীর ছাত্র অফিসারবৃন্দ একটি অনুশীলনে অংশগ্রহণরত

নৌবাহিনীর ছাত্র অফিসারবৃন্দ একটি অনুশীলনে ডিএসসিএসসি'র কমান্ড্যান্টের সম্মুখে ব্রিফিং প্রদান করছেন

জাতীয় সংসদ পরিদর্শন করছেন স্টাফ কলেজের বিদেশি অফিসার ও পরিবারবৃন্দ

মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

০৬ মার্চ ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত এমআইএসটি'র দশম গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

এমআইএসটিতে অনুষ্ঠিত 'Potential and Prospect of Innovative Electro Medical Technology Development in Bangladesh' বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব ইয়াফেস ওসমান

এমআইএসটি'র এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটি দল শিক্ষা সফরে বাংলাদেশ বিমান পরিদর্শন করছেন

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার তৃতীয় লুনাবোটিকস মাইনিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে এ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক তৈরিকৃত রোবট পরিদর্শন করছেন এমআইএসটি'র কমান্ড্যান্ট

আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ

এএফএমসি'র আওতাধীন কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

এএফএমসি'র ১১তম কাউন্সিল মিটিং এ সেনাপ্রধানের সাথে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

এএফএমসি'র কমান্ড্যান্ট কলেজের লাইব্রেরি পরিদর্শন করছেন

নজরুল জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে
এএফএমসি'র শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন এন্ড ট্রেনিং

এক্সারসাইজ শান্তিদূত-৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য দেশী-বিদেশী কর্মকর্তাবৃন্দ

Training of Trainers Course on Law of Armed Conflict কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন বিপসটে'র কমান্ড্যান্ট

বিপসট এ Trainging of Trainers Course on Protection of Civilian কোর্সের সিন্ডিকেট এর ক্লাস চলাকালীন একটি দৃশ্য

'এক্সারসাইজ শান্তিদূত-৩' এ বিদেশী প্রশিক্ষণার্থীগণ আহত ব্যক্তিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল/কলেজের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ

রচনা প্রতিযোগিতা-২০১২

সেনাবাহিনী

সাবরিনা ফেরদৌস রুমি (১ম স্থান)
শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ

তানজিনা মরিয়ম (২য় স্থান)
ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ

বি এম আতিউর রহমান রিপন (৩য় স্থান)
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল

নৌবাহিনী

আবিদুর রহমান সিয়াম (১ম স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

নুসরাত জাহান মীম (২য় স্থান)
বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা

সামিউর রহমান (৩য় স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

বিমান বাহিনী

মোঃ রাকিবুল ইসলাম (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

কাজী আব্দুর রাফসান (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, যশোর

এস এম সুমন (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-২০১২

সেনাবাহিনী

হাবিবা আক্তার রূম্পা (১ম স্থান)
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

আইমান উদ্দীন (২য় স্থান)
লেকার্স পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রাংগামাটি

সুদীপ্ত রাসেল (৩য় স্থান)
পার্বতীপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

নৌবাহিনী

সাবরিনা মনসুর (১ম স্থান)
বিএন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

শাওন জাহান বান্টি (২য় স্থান)
বিএন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

মোঃ মেহেদী হাসান (নীরব) (৩য় স্থান)
বিএন কলেজ, ঢাকা

বিমান বাহিনী

মাহির মহতাসিম তাহমিদ (১ম স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

সুমাইয়া সারাত (২য় স্থান)
বিএএফ শাহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

সিফাত শাহরিয়ার (৩য় স্থান)
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

Published by
Armed Forces Division

Assisted by
Education Directorate
Air Headquarters

Printed at
Helpline resources, Dhaka

F 25

সশস্ত্র বাহিনী দিবস জার্নাল ২০১২

ARMED FORCES DAY JOURNAL 2012

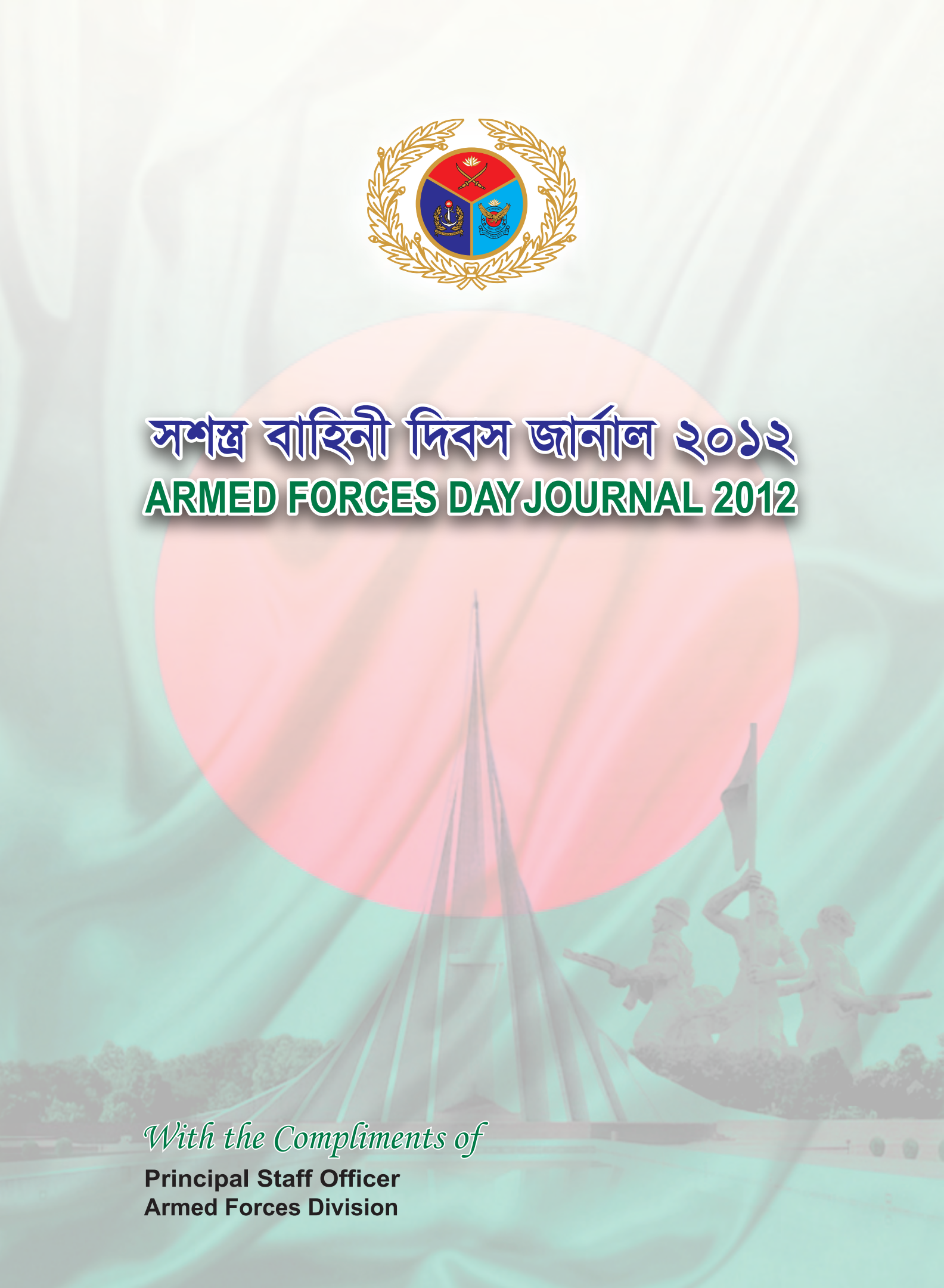

With the Compliments of

Principal Staff Officer
Armed Forces Division